ছবি

- শারমিন আক্তার

রোজা শুরুর কিছু দিন আগে আমার ফুপাতো বোন বিয়ের প্রস্তাব দেন কুষ্টিয়া পেয়ারাতলার একটা ছেলের। আমার বিয়ে সম্পর্কে আমার বাবা-মা সেভাবে কখনো ভাবেননি। ছেলেটা সম্পর্কে জানার পর থেকেই বাড়ির সবাই-ই আগ্রহ প্রকাশ করেন।

আমার চাচাতো বোনের মাধ্যমে ব্যাপারটি জানতে পেরে হাসিতে উড়িয়ে দিই। কারণ আমি কখনোই বিশ্বাস করতাম না যে, এতো অল্প বয়সে আমার বিয়ে হতে পারে। রোজার ভেতরে একদিন ছেলের বায়োডাটা নিয়ে হাজির আমার ফুপাতো ভাই।

আমি একটু চঞ্চল প্রকৃতির মেয়ে। তাই আমিও আগ্রহ সহকারে বায়োডাটাটা দেখলাম। ছেলে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি, এইচএসসি-তে স্ট্যান্ড করেছে। বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং করেছে। এখন ইসলামি ব্যাংক টাওয়ারে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে চাকরিরত। পরিবারের সবার সম্পর্কে আরো কিছু জানলাম। সবার শেষে জানলাম তারা ইসলামিক মাইন্ডেড।

আমি বোরখা পরি না।

তাই আমাকে পছন্দ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আমি তো মহাখুশি। মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়ায় আমার ছবি ও বায়োডাটা নিয়ে যাচ্ছে আমার চাচাতো ভাই। আমিও যাবো ঈদের শপিং করতে। আমরা যখন কুষ্টিয়া লাভলি টাওয়ারে তখন ছবি পৌছিয়ে এলেন চাচাতো ভাই রাশেদভাই । এবার ছেলের ছবি দেখার পালা।

ঈদের আগের দিন ছেলে বাসায় এসেছে। তাই আমার রাশেদভাই গেলেন ছেলেকে দেখতে। সন্ধ্যার পর ফিরে এলেন ছেলের দুটা ছবিসহ। আমার চাচাতো বোন ছবি দেখে আমাকে জানালেন, মোটামুটি দেখতে। তবে দাতগুলো সুন্দর।

সবার শেষে ছবি দেখানো হলো আমাকে। এক কথায় একটা ছবিতে এক রকম লাগছে, অন্যটাতে একদম ভালো লাগছে না। ছবি দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সবাই আমাকে বলছে, সবার তো আর ক্যামেরা ফেস ভালো হয় না। সরাসরি না দেখলে কিছু বলা যাবে না। সেই রাতে অনেক কেদেছি, আমি এমন ছেলেকে বিয়ে করবো না।

সবার কথা, দেখতে এলেই তো আর বিয়ে হয়ে যায় না।

পরের দিন ঈদ। কিছুতেই ঈদের দিনটাকে উপভোগ করতে পারছি না। অনেক চেষ্টা করছি। কিন্তু মজা পাচ্ছি না। শুধু মাথার মধ্যে ঘুরছে একটা কথা, কালকে ছেলে পক্ষ দেখতে আসবে, তখন কি হবে! কাউকে কিছু বলতেও পারছি না।

প্রথম কারা যেন আমাকে দেখতে আসছে, তবুও আমার মধ্যে কোনো অনুভূতি নেই। অন্য আমি খুব স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছি সারা বাড়ি। চারদিকে রান্নার আয়োজন, সবাই ছোটাছুটি করছে আর আমি আমার চাচাতো বোনকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছি। যদি আমাকে হেটে দেখাতে বলে, যদি আমাকে কোরআন শরিফ পড়ে শোনাতে বলে ইত্যাদি।

দুপুরের পর ছেলে পক্ষ এলে আমাকে শাড়ি পরিয়ে তাদের সামনে হাজির করা হলো। বিভিন্ন প্রশ্নের পর আসরের নামাজের বিরতি দেয়া হলো আমাকে এবং এটাও জানানো হলো যে, নামাজের পর আমার সঙ্গে ছেলে একা কথা বলবেন।

ব্যস, বাইরে এসে সবাইকে বলে বেড়াচ্ছি, জানিস, ছেলেটাই আমার সঙ্গে একা কথা বলবেন। আমি কেন যে এমন পাগলের মতো করেছি জানি না। না, আমার সঙ্গে একা কথা বলেননি। আমার বাবা-মা,বড় ভাবী, আমি এবং ছেলে, সবাই ছিলাম।

সবশেষে তিনি জানালেন, যদি আমাদের কোনো আপত্তি না থাকে তাহলে আজই বিয়ের কথা সম্পন্ন করতে চান।

আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি কথাটা শুনে। আমার বিয়ে হবে! আমার মতামত নেয়ার আধঘণ্টার মধ্যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের দিন সেভাবে দেখা হয়নি তাকে। এখনো ওই দিনটা আমার কাছে স্বপ্নের মতো মনে হয়। এখন যখন তাকে মনোযোগ সহকারে দেখি তখন সত্যিই মনে হয়, বিধাতা তাকে বড় ধৈর্য সহকারে বানিয়েছে।

ওই ছবিটা দেখে তো কান্না আসবেই, ওটা যে অনেক আগের ছবি ছিল। ছবি তোলার প্রতি তার আগ্রহ কম। তাই বাধ্য হয়েই পুরনো ছবি পাঠানো হয়েছিল।

ঈদের পরের দিন বিয়ে। তার আঠারো দিন পর আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে হলো। এর মাঝে চিঠি দেয়া ও ফোনে কথা হয়েছিল আমাদের।

এখন আমি বোরখা পরি।

বাড়ির সবাই বলে, আমি নাকি সেই আগের মতো আর দুষ্টুমি করি না। আমি সত্যিই ভাগ্যবতী যে, আমি তার মতো জীবনসঙ্গী পেয়েছি। আমি এখন তার ছোটবৌ। বাবা-মাকে প্রাণভরে দোয়া করতে ইচ্ছে করে, তাদের জন্যই আজ আমি এতো সুখী।

কমলাপুর, ঢাকা থেকে

বিষাদময়

- মোহাম্মদ রাসেল আহমেদ

আজ থেকে পাচ বছর আগের ঘটনা। আমি ছোটখাটো এক ব্যবসা করি। বেচা-বিক্রি তেমন ভালো ছিল না। তাই বাড়ির কারো জন্য কোনো জামা-কাপড় কিনিনি। মনে মনে ভেবেছিলাম ঈদের আগের রাতে বাবার জন্য একটা পাঞ্জাবি এবং মায়ের জন্য একটা শাড়ি কিনবো। ছোট ভাই-বোনদের কিছু না-ই বা দিলাম।

ঈদের আগের রাতে বিক্রি একটু ভালো হলো, তাই আগের সিদ্ধান্ত বাদ দিয়ে আমি ছাড়া বাড়ির সবার জন্যই কম-বেশি কাপড়-চোপড় কিনলাম।

তখন রাত প্রায় তিনটা ছুই ছুই। ঈদের আগের রাত হওয়াতে রিকশা পেতে কোনো রকম বেগ পেতে হয়নি। তাই খালি রিকশায় চেপে বাড়ির পথ ধরলাম।

রিকশা কিছু দূর যাওয়ার পর গলির মুখে আসতেই ছয় সাতজন যুবক রিকশার গতিরোধ করলো। তারা আমার মাথায় পিস্তল ধরে হাতের সব কাপড়-চোপড় নিয়ে বললো সঙ্গে যা আছে সব কিছু দিয়ে দিতে।

আমার কাছে দশ হাজার টাকা ছিল। বের করতে একটু দেরি হওয়াতে তাদের একজন আমার হাতে ছুরি মেরে টাকাগুলো কেড়ে নিয়ে চম্পট দিল সকলে মিলে।

গায়ের শার্ট দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে কোনো মতে বাড়ি ফিরলাম।

বামা-মা আমার অবস্থা দেখে তো কেদেই অস্থির। জানতে চাইলেন কি হয়েছে।

সব খুলে বললাম।

পরদিন ঈদ। সবাই নতুন জামা-কাপড় পরেছে শুধু আমার ছোট দুই ভাই-বোন ছাড়া। দুই চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো আমার। তাদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে গত রাতের সব অঘটন ভুলে গেলাম যেন কোনো কিছুই হয়নি।

শ্যামলী, শ্রীমঙ্গল থেকে

চাল ও ভাত

- মোহাম্মদ আবদুস সাত্তার মিলন

জীবিকার তাগিদে সোনার বাংলার শ্যামল ছায়ার কমনীয় মায়া ছেড়ে সউদির রুক্ষ মরুময় আবহাওয়াতে কাজ করতে এসেছি সেই ১৯৯৫ সালে। এখানে আসার পর সুযোগ করে পবিত্র ওমরা করলাম। এরপর প্রিয় নবী (সাঃ)–এর রওজা মোবারক জিয়ারতের অদম্য বাসনা মনে মনে লালিত করতে লাগলাম কখন যে আল্লাহপাক সুযোগ করে দেবে সেই আশায়।

এখানে আমার স্বদেশি ভাইয়েরা সময় সুযোগ পেলেই যার দ্বারা যতো বেশি সম্ভব ওমরা, হজ ও মদিনা–মনোয়ারা জেয়ারত করতে থাকেন। এটা হয়তো বা আমাদের ধর্ম প্রীতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ এবং আল্লাহপাকের রহমতও।

আমি তখন আমার শ্রদ্ধেয় শ্বশুরের দোকানে সেলসম্যান হিসেবে চাকরি করি। একদিন সুযোগ বুঝে শ্বশুরকে বললাম যে, মদিনা শরিফ জেয়ারত করতে যাবো।

তিনি রাজি হলেন এবং প্রয়োজনীয় খরচের টাকা দিলেন।

যথাসময়ে এক সউদির লিমোজিনে উঠে রওনা দিলাম। আমার সহযাত্রীর মধ্যে পাচটি দেশের মানুষ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশি আমিই মাত্র একা। বিদেশি ভাষা সবেমাত্র অ–আ–র পাঠ চলছে। ইংরেজিতেই বেশির ভাগ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

যাত্রাপথে আমার সহযাত্রীরা দুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজির সমঝদার হলো না। যে পাকিস্তানি আমার সহযাত্রী ছিল সে উর্দুতে আমার সঙ্গে *বাৎচিৎ* করতে লাগলো। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা পিতার সন্তান হওয়ার কারণে ঘৃণা হতে লাগলো তার প্রতি। যদিও তার কথার প্রতিউত্তরে দুই একটা শব্দ (নতুন শেখা) আমাকেও বলতে হচ্ছে। আমি তার কথার শতকরা আশি ভাগ বুঝলেও পুরো জবাব দিতে পারছি না। কারণ আমার উর্দুর স্টক সীমিত। এমনিভাবে প্রায় চারশ কিলোমিটার পথের ভ্রমণ চলতে লাগলো।

মরুভূমির সৌন্দর্য দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য হলাম এটা দেখে যে, এই পাথুরে মরু অঞ্চলের পাথরে ও বালি মিশ্রিত এই জমিনে যেখানে গড় তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াস–এর মতো থাকে সেখানে কি করে মরু বেদুইনরা সবুজের সমারোহ ঘটালো! বিশেষ করে সবজি ক্ষেতের দৃশ্য যে কোনো ভাবুক হৃদয়ের মানুষকে ও নতুন আগন্তুকে অবশ্যই আশ্চর্যান্বিত না করে ছাড়বে না।

হাইওয়ের পাশে মাঝে মধ্যে চোখে পরে ইংরেজি ও আরবিতে লেখা *ওয়াদি ফাতেমা, ওয়াদি* এ রকম লেখা সাইনবোর্ড। ওয়াদি মানে ঝরনা। আর বুঝলাম না যে, এই মরীচিকার মাঠে ঝরনা এলো কোত্থেকে? তবে আমার মনে হয়েছে যে, এই ওয়াদি মানে পানির কূপও হতে পারে যেখানে প্রাকৃতিক পানি জমা থাকতে পারে অথবা বৃষ্টির সময়ে পানিগুলো জমা হয়। মরুচারী বেদুইনারা সেখান থেকে তাদের প্রয়োজন মেটায়।

হাইওয়ের পাশে বেশ কয়েক কিলোমিটার দূরত্ব রেখে পেট্রল স্টেশন সংলগ্ন (প্রায় সব স্টেশনেই) রয়েছে হোটেল। স্থানীয় ভাষায় এগুলোকে *মাতাম* বলে। আর এই মাতামগুলোর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট হলো, এগুলো মেঝেতে কার্পেট বিছিয়ে এর ওপর বিভিন্ন সাইজের ফোমকে (শক্ত) গিলাফ বা কভার লাগিয়ে, সাজিয়ে দেয়। এবং কিছু ফোমকে অনেকটা কোলবালিশের মতো সাইজ করে এর সঙ্গে *ঠেস* দিয়ে অনেকটা নবাবি হালে এর ওপর সউদি ও অন্যান্য অ্যারাবিয়ান লোকেরা বসে। এরপর শুরু হয় আলসে ও আয়েশি ভঙ্গিতে হুক্কা পান। স্থানীয় ভাষায় এটাকে বলে *শিসা*। এই পানের আসর চলতে থাকে পুরো রাত পর্যন্ত। সঙ্গে থাকে যার যার পছন্দ মতো ফ্রায়েড রাইস উইথ চিকেন, ফিশ ফ্রাই ইত্যাদি।

ভ্রমণ পথে দুপুর হওয়াতে ড্রাইভার তেমনি এক হোটেলের সামনে গাড়ি পার্ক করলো। উদ্দেশ্য রেস্ট নেয়া এবং মধ্যাহ্ন ভোজন।

আমারও ক্ষিধে পেয়েছিল বেশ। তাই ঢুকলাম এই বেদুইনদের নবাবি মার্কা হোটেলে। যে যার মতো অর্ডার দিচ্ছে, খাচ্ছে।

পাকিস্তানি হোটেলবয় এলো আমার সামনে। জিজ্ঞাসা করলো, *কেয়া চাইয়ে?*

ধরনি দ্বিধা হও! *যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই...*। একে তো পাকিস্তানি। তাই তার সঙ্গে উর্দুতে কথা বলতে অনীহা। অন্যদিকে স্টকও সীমিত নতুন বলে। কি যে বলবো বা কি করে জবাব দেবো সে এক করুণ অবস্থা। এদিকে ক্ষিধেয় *ত্রাহি মধুসুধন*!

এই সামান্য উর্দুর জবাবও আসছে না মুখে। বসে থাকলে তো চলবে না। কিছু খেতে হবে। এও বুঝেছি যে, সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে কি ছাই! অনেক ভেবেচিন্তে জবাব দিলাম, *আপকি পাছ ভাত হ্যায়?*

জবাব শুনে সে বললো, *ভাত ক্যায়া চিতা হ্যায়?*

বলতে তো পারছি না যে, ভাত হলো আমরা যা খাই বিভিন্ন উপাদেয় সহযোগে। তাকে ইশারা ইঙ্গিতে বোঝালাম, *ভাত ক্যায়া চিজ হ্যায়*।

সে বুঝলো না। বার বার বলতে লাগলো যে, *হামারা পাস চাউল হ্যায়, মুরগি হ্যায়, সবজি হ্যায়। আপকো কোনসা চাইয়ে*।

যখন শুনলাম যে *চাউল হ্যায়* তখন আশার আলো দেখতে পেলাম। ছেলেবেলায় কখনো ভাত খেতে দেরি হলে একটু চাউল, সঙ্গে পানি খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য ক্ষিধের রাজ্য থেকে ছুটি নেয়া যেতো। সে কথা মনে পড়াতে বললাম, *ঠিক হ্যায়, চাউল দো*।

বলাতেই সে একটু পরে ফ্রায়েড রাইস-এর সঙ্গে গ্যাসের বিশেষ চুলোতে আগুনে পোড়ানো একটি মুরগির চার ভাগের এক ভাগ নিয়ে সামনে দিল।

ওমা একি! বললাম চাউল দিতে, দেখি সে ভাত-ই নিয়ে এলো! সঙ্গে কি সুন্দর গন্ধ ছড়ানো মুরগি!

তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ভাঙা ভাঙা উর্দুতে যে, বলেছি চাউলের জন্য, সে ভাত নিয়ে এলো কেন? আর ভাতই যখন ছিল সে প্রথমে বলেনি কেন? কেন চাউল বলে আমাকে এতো পেরেশান করলো?

তার জবাবে শিখলাম যে, *যা বিশ তাই কুড়ি*। অর্থাৎ আমাদের ভাত পাকিস্তানিদের কাছে চাউল!

তাকে বললাম যে, বাংলাদেশিরা তোমাদের চাউলকে ভাতই বলে থাকে। সম্ভবত আমার ধারণা যে, সে আমার মতো তার পরবর্তী কাস্টমারকে সার্ভ করার জন্য আমার শেখানো *ভাত* শব্দটিকে লিখে রাখবে।

সউদি আরব থেকে

এক টুকরো ভালোবাসা

- হেলাল উদ্দীন চৌধুরী

শরীরটা ভালো লাগছিল না। তাই অফিস ছুটির দুই ঘণ্টা আগেই বসকে ম্যানেজ করে বাসায় ফিরলাম। কাজের মেয়েটা দরজা খুলেই রান্নাঘরে চলে গেল।

রুমে ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল করলাম, পাশের রুমে বাবার মৃদু হাসির শব্দ। কিছুটা অবাক হলাম। এই সময়ে তো বাবার অফিসে থাকার কথা! বাবার রুমের দরজায় আস্তে করে হাত রাখতেই দরজাটা শব্দ করে উঠলো। বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল আমার।

আমার কাছে হাতে-নাতে ধরা পড়ে বাবা লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন।

আমি কপট রাগ দেখিয়ে, কপাল কুচকে বললাম, কি হচ্ছে এসব?

বাবা হালকা হাসিতে পরিবেশ হালকা করতে চাইলেন। বললেন, অফিসের এক কলিগের ছেলে বোর্ডে স্ট্যান্ড করেছে এসএসসি পরীক্ষায়। তাই সবাইকে মিষ্টি খাওয়ালো। ভাবলাম, তোর মা স্পঞ্জের মিষ্টি খুব পছন্দ করে। এ জন্য তোদের বকা থেকে বাচার জন্য তোরা বাসায় ফেরার আগেই চুপি চুপি তোর মাকে স্পঞ্জের মিষ্টি খাইয়ে যাচ্ছিলাম।

বাবাকে সাপোর্ট দিয়ে বাইশ বছরের কড়া ডায়াবেটিস রোগী আমার মা হেসে বললেন, দুই একটা মিষ্টি খেলে কিছু হবে না। আজ ইনসুলিন একটু বেশি নেবো।

আজ বাবা বেচে নেই।

কিন্তু সেদিন যে দৃশ্য দেখেছিলাম সেটা ছিল একজন ডায়াবেটিসের রোগী স্ত্রীকে তার স্বামী পরম মমতায় স্ত্রীর পছন্দের স্পঞ্জের মিষ্টি খাওয়াচ্ছেন।

আমি নিশ্চিত, এই পৃথিবীতে এ রকম চমৎকার ভালোবাসার দৃশ্য খুব বেশি একটা নেই।

চট্টগ্রাম থেকে
helal-slicl@yahoo.com

বৈধ অবৈধ

- শাহী সুরমা

২০০১ সালে বিয়ের পর এটা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা।

জনি সকাল পাচটার সময় ঘুম থেকে ডেকে তুললো, এই ওঠো, ট্রেনের দেরি হয়ে যাবে।

তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে গোসল করে নাশতা করলাম। বিয়ের পর বাবার বাড়ি ছাড়া এই বিশ দিনের মাথায় সিলেট যাচ্ছি হানিমুন করতে। এই আনন্দে নাশতার অর্ধেকও করতে পারলাম না। নাশতা শেষে গেলাম রেডি হতে। কিন্তু কি বিপত্তি! ভালো করে যে শাড়ি পরতেও পারি না। তখন সকাল প্রায় পাচটা।

ভাগ্নি মুক্তা ঘুম থেকে উঠে আমাকে সাহায্য করলো। দুষ্টুমি করে বললো, সিলেট গিয়ে মামাকে বলবে শাড়ি পরিয়ে দিতে।

মুক্তা আমার বয়সে অনেক বড়। কিন্তু তাকে আমি সব সময় নাম ধরে ডাকতাম। খুব ভালোবাসতাম তাকে। জনি এর মধ্যে গেল ট্যাকসি ডাকতে। ট্যাকসিতে ও আমার দিকে সরে আসাতে একদম কোণায় পড়ে গেলাম আমি। পরে দুজনই হেসে উঠলাম।

বিয়ের মাত্র এই কয়েকদিনের মাথায় জনি আমাকে এতো ভালোবেসে ফেলেছিল যে, এক মুহূর্ত না দেখে থাকতে পারতো না।

যাই হোক। কমলাপুর গিয়ে ও আমাকে ট্রেনে বসিয়ে গেল পত্রিকা কিনতে। প্রায় আধা ঘণ্টা পরও তার কোনো খোজ নেই। এদিকে আমার ভেতরে টেনশন শুরু হয়ে গেল। চারদিকে তাকাতেই হঠাৎ ডানপাশে দেখলাম ট্রেনের বাইরে জানালা দিয়ে সে আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি করে হাসছে। খুব লজ্জা পেয়েছিলাম। ইশারা করে তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে আসতে বললাম।

সে বললো, এক মিনিট।

পরে সে আমার পাশে এসে বসতেই জোরে ট্রেনের হুইসল দিয়ে উঠলো।

ভয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

সে তো হেসে কুটিকুটি।

পরে বললো, নাও, পত্রিকা পড়ো।

বললাম, না, গত রাতে ঘুমাইনি এক ফোটা প্রায়।

জনি বললো, আমারও তো একই অবস্থা।

আমার মাথাটা তার কাধে টেনে নিতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সারাটা পথ ধরতে গেলে তার কাধেই মাথা রেখে সিলেটে গেলাম। সিলেটে পৌছাতে দুপুর প্রায় দেড়টা বেজে গেল। দরগার সামনে খুব ভালো একটা হোটেলে উঠলাম আমরা। খেয়ে-দেয়ে গেলাম শাহজালাল (রা.)-এর মাজারে। এরপর গেলাম ক্যামেরার ফিল্ম কিনতে। সিলেটের এই হানিমুনকে ঐতিহাসিক করে রাখতে জনি আমাকে একটা *মণিপুরি শাড়ি* কিনে দিল।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি গোসল সেরে ও এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি ঘুম থেকে উঠতেই ও আমাকে বললো, উঠে গোসল সেরে নাও, আমি আসছি।

এতোটুকুই বিয়ের পর পর্যন্ত সুখ ভোগ করেছি। জনিকে এতো ভালোবাসতাম আর এতো ভালো ভাবতাম যে, তার সম্পর্কে নীচু কোনো মানসিকতা আমার ভেতরে জন্ম নেয়নি। সে বাইরে গিয়ে শেভ করলো। সে তার বিবাহিত খালাতো বোন যে তার থেকে বিশ বছরের বড় তাকে ফোন করলো।

আমি জানতাম না তার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক। হোটেলে ফিরে এসে সে আমার সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করলো। কারণটা আমি আরো পরে জানলাম। ওই মহিলা ছিলেন ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপিকা। কিন্তু স্বামীর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি একমাত্র ছেলেকে নিয়ে আলাদা থাকতেন। সে ছেলেও আমার বয়সী।

যাই হোক। সিলেটে আমরা আরো অনেক জায়গায় গেলাম। মালিনীছড়া চা বাগান, জাফলং, পর্যটন, শাহপরাণ (রা.)-এর মাজার এবং অনেক জায়গায়।

কিন্তু সে আমার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করতে লাগলো। আসলে সে ছিল অবৈধ পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত, সে কেন বৈধ বৌ-এর প্রতি মনোনিবেশ করবে?

ঢাকায় ফিরে সে আমাকে তার আত্মীয়স্বজন আমার বাবা, ভাই সবার সামনে অত্যন্ত খাটো করে তুললো। তাকে অনেক ফেরানোর চেষ্টা করছি আমরা সবাই। কিন্তু পারিনি।

এক পর্যায়ে সে এবং অধ্যাপিকা মিলে সিদ্ধান্ত নেয় আমাকে ডিভোর্স দিলে সব আবার আগের মতো হয়ে যাবে। ফলাফল শেষে ডিভোর্সই হলো।

কি দুর্ভাগ্য মহিলার। নিজেও জনির সঙ্গে সংসার করতে পারলো না। রোজার ঈদে ইনডিয়া যাবার পথে এক গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে মারা যান অধ্যাপিকা। জনি তখনো ইনডিয়ার হাসপাতালে। এমনকি খালাতো বোনের লাশের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাটুকুও সে জানাতে পারেনি।

আমি শেষের এই খবরটুকু পেয়েছিলাম আমার এক ভাগ্নের মাধ্যমে। মনকে তখন সান্ত্বনা দিয়েছিলাম যে, আল্লাহ অবৈধ কোনো কিছুই পছন্দ করেন না। জনি আমার ভালোবাসার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে যে অন্যায় আমার সঙ্গে করেছিল তার যথোপযুক্ত শাস্তিই সে পেয়েছে।

ঢাকা থেকে
shahi_surma@yahoo.com

উভয় সংকটের ঢাকা

- মোহাম্মদ মাহবুবুল হাকিম

২০০২ সালের আগস্ট মাসের দিকে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে কোচিং করতে ঢাকা যাই। এবং ফার্মগেটের *ইউসিসি কোচিং সেন্টার*-এ ভর্তি হই। সিলেটি হিসেবে আমি ও তাফসীর সব সময় এক সঙ্গেই থাকতাম। প্রথম ঢাকায় আসায় আমরা দুজনই চেষ্টা করতাম ফিটফাট থাকার। বেশ ভালোই দিন কাটছিল।

একদিন বিকেলে ক্লাস শেষে বের হয়ে ফার্মগেটের মোড়ে আসা মাত্রই একটি ছেলে আমাদেরকে আটকিয়ে নানান রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলো।

প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে যখন মানিব্যাগে কতো টাকা আছে জানতে চাইলো তখন বুঝলাম আমরা ছিনতাইকারীর পাল্লায় পড়েছি।

সবার চোখের সামনেই সে আমাদের হাতের বিদেশি ঘড়ি, টাকা-পয়সা নিয়ে চল্লিশ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে বিদায় করলো।

আমাদেরকে ছিনতাইকারীর ধরার কারণ হিসেবে মনে করলাম, এই ফিটফাট হয়ে চলাফেরা এবং সিলেটি আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলা।

এই ঘটনার আমি ও তাফসীর ঠিক করলাম যে, আর কখনো শার্ট ইন ও ক্লিন শেভ করে ঢাকার রাস্তায় চলাফেরা করবো না।

পরের দিন থেকেই আমরা একদম সাধারণ কাপড় পরে এবং জুতা পরা বাদ দিয়ে স্যানডাল পায়ে চলাফেরা শুরু করলাম।

সপ্তাহ খানেক যাওয়ার পর গাল ভর্তি খোচা খোচা দাড়ি নিয়ে আমরা সন্ধ্যার দিকে আসাদ গেটের সামনে দিয়ে হাটছিলাম।

হঠাৎ করেই পুলিশ আমাদেরকে আটকিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলো।

সেই সময় *অপারেশন ক্লিন হার্ট* চলছিল বলে দুজনই ভয় পেয়ে গেলাম। পোশাক এবং চেহারার এই বিধ্বস্ত অবস্থা দেখে পুলিশকে আমরা বিশ্বাস করাতে পারছিলাম যে, আমরা সিলেট থেকে এখানে কোচিং করতে এসেছি। মানিব্যাগের সঙ্গে তখন আমাদের কোচিং সেন্টারের আইডি কার্ডও হাতছাড়া হয়ে গেছে।

পরে কিছু দেখাতে না পেরে প্রভাবশালী এক মামার সহায়তায় সেদিন পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেলাম।

এরপর আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম ঢাকা শহরে আর থাকা যাবে না। যেখানে কি না ফিটফাট হয়ে চললে ছিনতাইকারীর কবলে পড়তে হয় আবার খুব সাধারণভাবে থাকলে পুলিশের হাতে পড়তে হয়! অগত্যা এই উভয় সংকটে পড়ে আমরা কোচিং ছেড়ে দিয়ে সিলেট চলে আসি এবং বিনা প্রয়োজনে ঢাকা না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

আমরা এখন শাহজালাল ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। তাই এই কয়েকটি বছরের জন্য আমরা অন্তত উভয় সংকটের ঢাকা থেকে রক্ষা পেলাম!

সিলেট থেকে

বন্ধ্যাত্ব

- আহমেদ আব্বাস্

স্ত্রীটি ঝাঝালো কণ্ঠে বলে, নিজে পারে না, শুধু আমার দোষ। আমি তো আবাদী জমি। এখানে যেমন চাষ করবে, যেমন বীজ দেবে, তেমন ফসল পাবে। নিজে শোধরাও।

কাজকর্ম নেই, সারা দিন শুধু ছেলে ছেলে! অনেকেরই তো ছেলেপুলে নেই, তাদের চলছে না। যখন তখন গোখরা সাপের মতো ফোস করে ওঠা।

কি আমি গোখরা সাপ! হ্যা, গোখরা সাপই তো। আমার ঠিকই বিষ আছে। তোমার তা থাকলে এতোদিন বাসাটা ফুলেফলে ভরে উঠতো।

একটু থেমে স্ত্রীটি আবার বলে, তুমি তো একটা ঢোড়া সাপ। শুধু শরীর ভর্তি রাগ। সামনে পেলেই ছোবল, কামড়। কিন্তু তাতে লাভ কি? বিষ নেই। বিষ থাকলে এক ছোবলেই লেগে যায়।

এভাবে দুটিতে লেগেই ছিল। দুই চার দিন ভালো কাটে আবার মেজাজ বিগড়ে যায়। কখনো পুরুষটির, কখনো মেয়ে লোকটির। জ্বলে আর নেভে, জোনাকির মতো। তাদের বিয়ে হয়েছে সাড়ে চার বছর। একজন টিচার ও অন্যজন হাউসওয়াইফ। সংসারে বিত্ত-বৈভব না থাকলেও অভাব নেই। কিন্তু অভিযোগ আছে, একজনের কাছে অন্যের সন্তান প্রাপ্তির অভিযোগ।

মেলিনা এসএসসি পরীক্ষায় কোনো মতে পাস করলেও কলেজমুখো হয়নি। পাস করে বেশি দিন বসে থাকেনি। দুই বছরের মাথায়ই বিয়েটা হয়ে যায়। বিয়ের চার বছর অতিক্রান্ত হলেও ফলাফল শূন্য। বয়স তেইশ পেরিয়ে হয়ে চব্বিশে পা দিয়েছে। এখন আর কিশোরী ভাব নেই। জলজ্যান্ত দীর্ঘাঙ্গিণী মহিলা। একটু মোটা আটসাট শরীর। দুই বাহুতে পুরুষের মতো লোম দৃশ্যমান। শ্যামলা ডিমালো মুখখানায় কোথাও ক্লান্তির ছাপ না থাকলেও কেমন যেন দুঃখী দুঃখী মনে হয়। সব সময় পান খেয়ে ঠোট জোড়া লাল করে রাখে। সন্তান না হলেও বুক দুটোর বাড় থামেনি। প্রথম বর্ষার কদম ফুলের মতো দৃষ্টি নন্দন। হাটতে গেলে পেছনে ভরা নদীর মতো ঢেউ খেলে যায়।

তিন বছর খুব একটা গা মাখেনি। চার বছর যেতে না যেতেই সন্তানের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মেলিনা। স্বামীও পিতৃত্বের দাবিদারে অপারগতায় যত্রতত্র প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। টনক নড়ে দুজনের। তাদের সাধ্য অনুযায়ী ক্রমাগত শরণাপন্ন হয়। কবিরাজি, হেকিমি, হোমিওপ্যাথি এবং এলোপ্যাথি। কেউই পিরিয়ডকে নিয়ত প্রতিরোধ করতে পারে না।

ছোট সীমান্ত শহর মেহেরপুর। মাত্র চার–পাচ মাইল দূরেই নদীয়ার সীমানা। অতি দূরেই শান্তিপুর এবং কৃষ্ণনগর। এই শহরের প্রায় ষাট শতাংশ লোকের শেকড়ই ওপার বাংলায় – নদীয়া, বাকুড়া, বীরভূম, কৃষ্ণনগরে। দেশ ভাগের আগে–পরে মাইগ্রেশনে এ দেশে। মেলিনার শেকড় ওপারেই। সন্তানের প্রত্যাশায় সাবলীলভাবেই পাড়ি দেয় ওপারে। কৃষ্ণনগর, কলকাতায় ডাক্তার দেখিয়ে ফেরে আবার মেহেরপুর, বাংলাদেশে।

দিন যায়। ওষুধ খায়। তবু শরীরে বর্ষা ভর করে না। কিন্তু মাদুলি, কবজ, তাবিজে শরীর ভরে যায়।

টিচার হাজব্যান্ড কারো কাছে শুনেছে, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তান প্রাপ্তির বিষয়ে নানান রকম বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। তারপর নিয়মিত পাবলিক লাইব্রেরিতে বিভিন্ন দৈনিক বিজ্ঞাপন অন্বেষণ। ইত্তেফাক, ইনকিলাব, প্রথম আলো, যুগান্তর ইত্যাদিতে রেডার সার্চিং।

একদিন কোনো এক দৈনিকে কাঙ্ক্ষিত বিজ্ঞাপন পেয়ে যায়। স্বামী–স্ত্রীতে অমিল, প্রেমে ব্যর্থতা, ব্যবসায় লোকসান, রতিক্রিয়ায় অপারগতা, সন্তান লাভে অক্ষমতা ইত্যাদি সমস্যার নিশ্চিত চিরস্থায়ী অবসান। বিফলে মূল্য ফেরত। বিজ্ঞাপনের অংশটুকু ফটোকপি করে বাসায় ফেরে আর *ইউরেকা ইউরেকা* বলে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে। তারপর বিজ্ঞাপন দেখায়। চটকদার বিজ্ঞাপন দেখে দুজনেই খুশি। জীবনের শেষ চিকিৎসা হিসেবে বিজ্ঞাপনদাতা পীরবাবার দর্শন লাভের জন্য দুজন একমত হয়।

পড়শির ঢাকার বাড়ি শেওড়াপাড়া। পীরবাবার কাছে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় এসে প্রথমে তারা শেওড়াপাড়ায় ওঠে। টিচার এর আগে ঢাকায় এলেও নির্ধারিত স্থানের বাইরে সবই অজ্ঞাত। শেওড়াপাড়া থেকে ভাসানটেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে চোদ্দ নাম্বার মোড়ে না নেমে ভুলক্রমে রজনীগন্ধা সুপারমার্কেট, কচুক্ষেত বাজারে নামে। একজনকে জিজ্ঞাসা করতেই সে কাফরুল মহাসাধক সিদ্ধিবাবার দর্শন লাভের জন্য দিক নির্দেশ করে।

রিকশা নিয়ে কাফরুল গন্তব্য স্থানে গিয়ে পত্রিকার দেখা বিজ্ঞাপনের চেয়ে ভারি এবং ওজনদার সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। সাইনবোর্ডের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আশপাশে জিজ্ঞাসা করে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। স্ত্রীটি বলে, যার দর্শন লাভের জন্য ঢাকায় এসেছি সেখানেই যাবো।

ভাসানটেকের উদ্দেশ্যে রিকশা চলতে থাকে। কাফরুল, ইব্রাহিমপুরে একই রকম আরো চোখ ধাধানো, প্রাণ জুড়ানো সাইনবোর্ড চোখে পড়ে। তবু তাদের রিকশা থামে না। চলতে থাকে, চলতেই থাকে।

এক সময় কাঙ্ক্ষিত পীরবাবার দরবারে পৌছে যায়। পাকা একতলা চমৎকার ফ্ল্যাট বাড়ি। সামনে রোগী দেখার জন্য দোকানের মতো বড় রুম। ভেতরে আরো চারটা রুম যেখানে মহিলাদের সাহায্যে মহিলা রোগী

দেখা হয়, যেখানে ওষুধ তৈরি হয় ইত্যাদি। সামনের রুমটায় একটা নরকংকাল, একটা হোমিও চিকিৎসার অগ্রদূত হ্যানিম্যানের প্রতিকৃতি, একটা ইউনানি ভেষজ গুণাগুণ সংক্রান্ত পোস্টার আর র‍্যাকগুলোয় থরে–থরে সাজানো ইউনানি এবং মোদক জাতীয় কবিরাজি ওষুধ। মাঝখানে স্পৃং লোডেড রিভলভিং চেয়ারে উপবিষ্ট পীরবাবা। ডানপাশে পর্দার আড়ালে কম্পাউন্ডার নিবিষ্ট চিত্তে কর্মরত। বাম পাশে আগত রোগীদের ওয়েটিং প্লেস।

মাঝারি গড়নের পেটানো শরীর। মজবুত পেশি। কব্জিগুলো বেশ মোটা। নয় ইঞ্চি বিঘাতেও বেড় পাওয়া সম্ভব নয়। পীরবাবার মুখে সুবিন্যস্ত মুখভর্তি দাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় দাড়িগুলো সব সময় ছেটে ইঞ্চির ভেতরে সীমাবদ্ধ রাখতে পছন্দ করেন। অনেকটা হিন্দি ফিল্মি হিরো নানা পাটেকারের মতো। তবে মাথায় পানসি নৌকার মতো কালো জিন্নাহ টুপি। পরনে শ্বেতশুভ্র পাজামা পাঞ্জাবি। বয়স চল্লিশ অতিক্রম করলেও সুন্দর মুখশ্রী পীরবাবার বয়সকে আড়াল করে রেখেছে।

মহা তান্ত্রিক পীরবাবা প্রথমে মেলিনার সহগামী স্বামীর সাক্ষাৎকার নেন।

কখনো ডাক্তার দেখিয়েছেন? সেনেন অ্যানালাইসিস করিয়েছিলেন? কোনো সমস্যা পাওয়া গিয়েছিল?

ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি। আমার কোনো সমস্যা নেই।

ধৈর্য ধরুন। আমার ওপর ভরসা রাখুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।

এরপর মেলিনার কাছে পীরবাবা জানতে চান, আপনি কোনো লজ্জা করবেন না। যা যা জানতে চাই, কোনো কিছু গোপন করবেন না। আপনার কি কখনো স্টেরিলিটি টেস্ট করা হয়েছিল? রিপোর্ট কি ছিল?

মেলিনা জানায়, কেউ কোনো সমস্যার কথা বলেনি।

তারপর বলে, পিরিয়ড কি নিয়মিত হয়? দিন, সময় হিসাবে করে কি কখনো একত্রিত হয়েছেন?

অত্যন্ত মোলায়েম এবং মার্জিতভাবে সমস্যাগুলো জেনে নেন পীরবাবা। যেহেতু অতি জটিল, গোপনীয় এবং পুরনো (যেমন হোমিওপ্যাথ সাইনবোর্ডে দৃশ্যমান) রোগের চিকিৎসক, সে কারণে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পীরবাবা ভালো জ্ঞান রাখেন। না হলে ব্যবসা চলবে কি করে!

তিনি প্রথমেই সরল অংকটা এভাবে মেলান। এমনো তো হতে পারে। কোনো কারণে গত চার বছরে আগত দম্পতি যথার্থ ওভ্যুলেশনের সময়ে মিলিত হতে পারেনি। ওভ্যুলেশনের সময়টাই হয়তো তারা বোঝে না।

ওভ্যুলেশনের সময় পিরিয়ডের বারোতম দিন থেকে ষোলতম দিন পর্যন্ত। হতে পারে, দর্শনার্থী দম্পতিদের অন্য কোনো সমস্যা আছে। আর যদি তা না হয়, স্বাভাবিকভাবে কনসিভ ব্যাহত হলে সন্তান লাভের উদ্দেশ্যে প্রথম মাসে বারোতম দিন, দ্বিতীয় মাসে তেরোতম দিন, তৃতীয় মাসে চোদ্দতম দিন, এভাবে ষোলতম দিন পর্যন্ত।

এরপর পীরবাবা বলেন, খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখবেন আর আমার প্রতি ভরসা রাখবেন। নিশ্চিত আপনাদের সন্তান হবে। কোনো চিন্তা করবেন না। পীরবাবার আশ্বাসে খুশিতে মেলিনার দেহমন বিগলিত হয়ে ওঠে। মরুর মতো বিরান তপ্তভূমিতে বর্ষণের আগে মেঘের আভা দেখে চোখ জ্বল জ্বল করে। ফসলের আশাবাদে শূন্য বুক তৃপ্তিতে ভরে যায়। ময়ূরের মতো পেখম মেলে নাচতে ইচ্ছে করে তার।

পীরবাবা কাচের বোতলে পানি ফু দিয়ে পড়ে দেন। কিছু ভেষজ ওষুধ দেন। এবং নিয়মিত সেবনের জন্য ব্যবস্থাপত্র লিখে দেন। তারপর বলেন, পিরিয়ডের বারোতম দিন গোসল সেরে পাকসাফ হয়ে সকাল দশটার মধ্যে এখানে আসার চেষ্টা করবেন। আসার আগের দিন রাতে হালুয়া জাতীয় যে ওষুধটা দিয়েছি সেটা দুই ডোজ খাবেন।

নির্ধারিত দিনে কাটায় কাটায় সকাল দশটায় মেলিনা স্বামীসহ পীরবাবার দর্শন প্রার্থী হিসেবে হাজির হয়।

দুই একজন পুরনো জটিল রোগী ছাড়া অন্যদেরকে সেদিনের মতো তাড়াতাড়ি বিদায় করে পীরবাবা মেলিনার কেসটা হাতে নেন।

এবার সামনে রোগীর আসনে বসে মেলিনা।

বাবা জেরা শুরু করেন, এ কয়দিন কেমন কাটলো। ওষুধ নিয়মিত সেবন করেছেন তো। আজকে আরো কিছু নতুন দোয়া-দাওয়া দেয়া হবে। প্রয়োজন হলে আরো দুই একবার আসতে হবে। তার আগে এখন আমার মহিলা হেকিম দ্বারা আপনার একটু স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো দরকার। বলতে বলতেই ভেতর থেকে একজন রাশভারী মহিলা মেলিনাকে ডেকে নেয়।

পীরবাবা স্বস্থানে উপবিষ্ট থেকে মেলিনার স্বামীকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ এবং দাওয়াই খাবার ব্যাপারে উপদেশ দিতে থাকেন।

মহিলা হেকিম পীরবাবার বিশেষ চিকিৎসা রুমে মেলিনাকে নিয়ে প্রথম দুই ডোজ যৌন উদ্দীপক মোদক খাইয়ে দেন। তারপর বলতে থাকেন, দেখো বোন, জগতে যে নারীর সন্তান নেই তার জীবনই বৃথা। তার বেচে থাকা আর মরে যাওয়া সমান কথা। লোকে বলে, বাজা। অনেক মহিলাই তার কোলে শিশু সন্তান দিতে চায় না। এ জন্য এ দেশের অনেক মেয়েরই সুখের সংসার ভেঙে গেছে। তুমি কি চাও না? তোমার কোল আলো করে একটা ফুটফুটে বাচ্চা আসুক। না চাইলে তোমার শাশুড়িই বলবে, আমার এমন বাজা বৌয়ের দরকার নেই। ও ব্যাটা, তুই ওই বৌকে তালাক দে।

মেলিনার বুকটা হাহাকার করে ওঠে।

আপা আর বলবেন না। আমার একটা বাচ্চা চাই। আপনারা দোয়া-দাওয়া দিয়ে ব্যবস্থা করেন।

মহিলা হেকিম বুঝতে পারে, মোটিভেশনে বরফ গলতে শুরু করেছে। পুনরায় বলে, এখন পীরবাবা এখানে এসে তোমাকে ভালো করে দেখবেন। যা যা বলবেন কোনো কিছুতেই না করো না। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু সন্তান না হলে তোমার জীবনের কোনো দাম নেই। ঠিক আছে, তুমি বসো, আমি তাকে ডাকছি। এই বলে মহিলা হেকিম সামনের রুমের দরজার কাছে যায়। স্যার, আপনি কি রোগীকে একটু দেখবেন? সামনে উপস্থিত মক্কেলকে এক মিনিট বলে পীরবাবা ভেতরের রুমে চলে আসেন। বাবাকে লক্ষ্য করে মহিলা হেকিম বলেন, এই যে বোন, ঠিকঠাক মতো তার খেদমত করো।

পীরবাবা জিজ্ঞাসা করেন, সব ঠিক আছে তো?

শুনে মেলিনা রা করে না।

আবার বলে, ধরে নেন এটা একটা স্বপ্ন। এমন অনেক কিছুই হয়। হরহামেশাই হচ্ছে। এটা কিছু না। খামচাখামচি যৌবনে এমন অনেক হয়। ইচ্ছে করলে, কাপড়-চোপড়ে যাতে ভাজ না লাগে এ জন্য খুলে আলনায় রাখতে পারেন।

তারপর ধূর্ত পীরবাবা দেয়ালে ঢাকা নীল কাপড়ের পর্দাটি টেনে সরিয়ে ফেলেন। ভেসে ওঠে নারী-পুরুষের যুগল মৈথুন দৃশ্যের আবক্ষ পোস্টার।

মেলিনা ঘোরে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই চিকিৎসা পর্বের সমাপ্তি ঘটে যায়।

মেলিনা লাগোয়া বাথরুমে ফ্রেশ হয়ে বের হওয়ার আগেই ঘোড়েল পীর রুম থেকে বের হয়ে যায়। আর এ সময়ই মহিলা হেকিম রঙ্গলীলা স্থানে প্রবেশ করে। এবং বলতে থাকে, দেখো বোন, এ ঘটনা জীবনে ভুলক্রমেও কাউকে বলবে না। বললে তোমারই ক্ষতি। জানলে তোমার স্বামী তোমাকে তালাক দেবে। ও হ্যা, শোনো, এবার তুমি পিরিয়ডের তেরোতম দিনে আসবে।আর যদি না হয়, তবুও আজ থেকে দেড় মাস পরে আসবে।

কাকতালীয়ভাবে যথাসময়ে পিরিয়ড না হওয়ায় তারা দেড় মাস পরে পীরবাবার দরবারে হাজির হয়।
সব কিছু শুনে পীরবাবা বললেন, সবই নসিব। আশা করছি, আপনাদের মনোবাসনা পূরণ হতে যাচ্ছে। তারপর কাছেই রজনীগন্ধা সুপারমার্কেটে ইউরিন টেস্টের পরামর্শ দেন।
ইউরিন টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ হওয়ায় স্বামী-স্ত্রী দুজন হাসিমুখে কথিত মহা তান্ত্রিক পীরবাবার সামনে কিংসাইজের মিষ্টির প্যাকেটসহ উপস্থিত হয়। এরপর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সেরে দোয়া-দাওয়া নিয়ে এক হাজার এক টাকা নজরানা দিয়ে তারা তাদের মফস্বল শহরের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করে।

চলনবিল, নাটোর থেকে

একা সুইটজারল্যান্ডে

- মাহবুব ভূইয়া

১৩ আগস্ট ইটালির মিলান রেল স্টেশন থেকে সুইটজারল্যান্ড-এর বাসেল শহরে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটাতে যাচ্ছি। দীর্ঘ চার বছর বাসেল শহরে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থী হিসেবে ছিলাম। সেই স্মৃতি বিজড়িত বাসেল শহর সকল দুঃখ-কষ্ট-আনন্দ নিয়ে উন্নত দেশে অনুন্নত জীবন যাপন আজও স্মৃতিতে ভেসে আছে। কতো তরুণ যুবক চুক্তি ভিত্তিক বিয়ে করে তার সর্বস্ব দিয়ে চল্লিশ পয়তাল্লিশ বয়স্কা মহিলাদের সঙ্গে অমানবিক জীবন যাপন করছে। সেই কথা ভাবতে আজও গা শিউরে ওঠে।
সারা সুইটজারল্যান্ডে সর্বমোট হাজার তিনেক বাংলাদেশির মধ্যে আনুমানিক দুই হাজার চুক্তি ভিত্তিক বিয়ের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে বাস করছে। এর মধ্যে স্ত্রীর সঙ্গে গুটিকয়েক যুবক সহবাস করছে না। শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সর্বমোট দশজন বাংলাদেশি মাস্টার্স হবে কি না সন্দেহ। বিশ পচিশজন গ্র্যাজুয়েট পাওয়া যাবে। শিক্ষিত তরুণরা বিয়ে নামের অমানবিক কষ্টকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ না করে অন্য দেশে পাড়ি জমাচ্ছে।
হঠাৎ ট্রেনের মাউথ স্পিকারে ঘোষিকা ইংরেজি, জার্মান ও ইটালিয়ান ভাষায় সকলকে স্বাগতম জানালো। তিনটায় ট্রেন যাত্রা শুরু করলো এবং পরবর্তী স্টপেজ কোমো (Como) ঘোষণা করায় মনে পড়ে গেল *মাসুদ রানা* সিরিজের সুইস-ইটালি সীমান্তের মনোরম লেক সমৃদ্ধ শহরটির কথা।
যেমন ইচ্ছা ঠিক তেমনি সেই কাজটিই মনের অজান্তে করে ফেললাম। নেমে পড়লাম কোমো স্টেশনে। আধঘণ্টা হেটে পৌছে গেলাম লেকের পাড়ে। কি অপরূপ দৃশ্য। বৃহৎ লেকের চারপাশে সাজানোভাবে রক্ষিত প্রচুর ছেলেমেয়ে, কিশোর-কিশোরী ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। কেউ তার প্রিয়তমকে স্বাধীনভাবে আদর করছে। চারদিক দেখে নিরিবিলি এক কোণে পাথরের উপর বসে উপভোগ করছি সমস্ত দৃশ্য। খুবই ভালো লাগছে একাকি।
মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেল জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির লেকটির কথা। প্রিয়তমা স্ত্রী পরিসংখ্যান বিভাগের ছাত্রী সাবিহা সুলতানার কোলে মাথা রেখে শুয়ে ছিলাম। আদরে আদরে ভরে দিয়েছিল আমার সমস্ত দেহ-মন। লেকটির পাড় ঘেষে আম বাগান যাওয়ার রাস্তার ঢালে অনেক প্রেমিক যুগলের পাশে সে আমাকে বুকে আগলে রেখেছিল কতোক্ষণ জানি না। শুধু মনে পড়ে, সেদিন ওই সময় সমস্ত সুখ এসে ভিড় করেছিল আমার কাছে যা আজও অনুভব করি।
স্ত্রীর করুণ আকুতি, *আমাকে একটু আদর করো না লক্ষ্মীটি*। এখনো কানে বাজে।
তাকে অনেক ভালোবাসি। মাঝে মাঝে ভয়, বেশি ভালোবাসলে যদি হারাতে হয় প্রিয়তমাকে! তবুও মন মানে না। ভীষণ আদর করতে ইচ্ছা হয়। প্রবাসে থাকি। তাই কাছে পাই না। মাঝে মধ্যে মন বিগড়ে উঠে প্রিয়তমার বুকে মুখ গুজতে। কিন্তু সন্ত্রাসের দাপটে দেশে ফিরতে মন চায় না।

আজ দুপুরেই স্ত্রীর মোবাইল ফোনটি হারানোর কথা আমাকে কষ্ট দেয়। ফোনে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে দুঃসংবাদটি আমাকে দেশে ফিরতে অনুৎসাহিত করে।

আচমকা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ায় ভাবনায় ছেদ পড়ে। কখন যে সন্ধ্যা পেরিয়ে নয়টা বেজে গেছে, সূর্য নিভু নিভু করছে টের পাইনি। লেকের পাড় জনমানবহীন হয়ে পড়েছে।

সময় নেই, আধঘণ্টার মধ্যে রেল স্টেশন যেতে হবে। লোকাল ট্রেন ধরে কিয়াসো হয়ে লুগানো এবং সেখান থেকে রাতের ট্রেনে সরাসরি বাসেল। স্টেশনে পৌছাতেই আমার দ্রুততা এবং বিদেশি দেখে কোথা থেকে দুজন ইটালিয়ান পুলিশ ভদ্রতার সঙ্গে আমার পাসপোর্ট দেখতে চাইলো।

দ্রুত পাসপোর্ট এবং ইটালিতে বসবাসের অনুমতিপত্র বের করে অনুরোধ করে বললাম, *নন সে টেম্পু, ইও বাদো সিভ্‌সেরা পার ভিয়াজ্জ*। অর্থাৎ সময় নেই, আমি সুইসে বেড়াতে যাবো।

পুলিশ দুজন দ্রুত আমার কাগজপত্র ফেরত দিয়ে বললো, বনও ভিয়াজ্জ। অর্থাৎ শুভযাত্রা।

তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লাম।

ট্রেন ছুটে চললো গন্তব্য স্থানে।

ব্রেসিয়া, ইটালি থেকে

দক্ষিণ ভারতে

- তানজিত

১৯৯৮। আমার বেস্ট ফ্রেন্ড স্বপন এইচএসসি পাস করে চলে গেল ইনডিয়ার ব্যাঙ্গালোরে বিবিএ করার জন্য। ১৯৯৮ সালের মে মাসে দেশে এসে স্বপন আমাকে বললো, পাসপোর্ট কর, তোকে ব্যাঙ্গালোর নিয়ে যাবো। শুরু হলো আমার ইনডিয়া ভ্রমণের প্রস্তুতি। সুতরাং পাসপোর্ট করে ভিসা লাগিয়ে জুন মাসের ৮ তারিখ আমরা রওনা হলাম ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে।

৮ তারিখ রাত দশটায় মালিবাগের *সোহাগ* বাসে পরদিন সকাল সাতটায় বেনাপোল হরিদাসপুর চেকপোস্টে এবং দুপুর দুইটায় কলকাতার ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে *হোটেল প্যারামাউন্ট*-এ।

দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে বের হলাম কলকাতা দেখতে। প্রচুর কেনাকাটাও করলাম। পরদিন ৯ জুন সকাল নয়টায় কলকাতার হাওড়া স্টেশন থেকে *করমন্ডল এক্সপ্রেস*-এ করে রওনা হলাম হায়দ্রাবাদের উদ্দেশ্যে। ৯ ও ১০ জুন সারা দিন ও সারা রাত এবং ১১ জুন সারা দিন থাকার পর সন্ধ্যায় পৌছালাম হায়দ্রাবাদে। সে এক মজার জার্নি। হায়দ্রাবাদে *হোটেল মিডল্যান্ড*-এ রাত কাটালাম। পরদিন ১২ জুন সকালে গোসল ও নাশতা খেয়ে বের হলাম হায়দ্রাবাদ দেখতে। শুক্রবার থাকায় মিউজিয়াম ছিল বন্ধ। দেখা হলো না হায়দ্রাবাদ মিউজিয়াম। ট্যাকসির ড্রাইভার আমাদের নিয়ে গেল মন্দির দেখাতে। বিশাল বড় ও উচু এক পাহাড়ের ওপর এ মন্দির। পাহাড়ের রাস্তা কেটে সিড়ির মতো করা হয়েছে।

অনেক কষ্টে সিড়ি বেয়ে মন্দিরে পৌছালাম। বর্তমানে *গোল্ড মন্দির* নামে পরিচিত। কারণ মন্দিরের মাঝখানে এক বিশাল উচু পিলার যা সম্পূর্ণই সোনার। আশপাশেও অনেক সোনার কারুকাজ করা জিনিস। পুরো মন্দির ঘুরে দেখলাম ও ছবি তুললাম। সন্ধ্যা ছয়টায় বাসে করে রওনা হলাম ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে।

পরদিন ১৩ জুন শনিবার সকাল আটটায় পৌছালাম স্বপনের ব্যাঙ্গালোরের বাড়ি। সারা দিন বিশ্রাম নিলাম। পরদিন থেকে শুরু হলো ব্যাঙ্গালোর দেখা। যেদিক দেখি, যা কিছুই দেখি সব কিছু এতো সুন্দর ও পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন যে নিছু চোখে না দেখলে লিখে বর্ণনা দেয়া যায় না।

স্বপন থাকতো ব্যাঙ্গালোরে *আরিকারী* নামের এক জায়গায়। সেখান থেকে তার হন্ডা দিয়ে ব্যাঙ্গালোর ঘুরে দেখা। এমজি রোড, জয়ানগর সব জায়গা ছবির মতো সাজানো গোছানো। দেখলাম হাই কোর্টসহ অনেক

কিছু। হিন্দি সিনেমা দেখলাম *দুশমন, যব পেয়ার কিসিসে হোতা হ্যায়, ঘরওয়ালী–বারওয়ালী*–সহ আরো কিছু সিনেমা। সিনেমা হলগুলোর পরিবেশ অনেক সুন্দর। স্ক্রন বড়, ডিজিটাল সাউন্ড সিনেমা দেখার মজাই আলাদা। *সওগাত* ও *সাগর* নামের এ দুটে সিনেমা হল সবচেয়ে বেশি সুন্দর।

তারপর সাত দিন ব্যাঙ্গালোর দেখার পর ২০ জুন গেলাম উটি (Ooty) নামের স্থানে। প্রায় সাড়ে সাত হাজার ফিট উপরে এ উটি রাজ্য অবস্থিত। রাত পুরোটাই লাগলো পাহাড়ের এই উচু দেশ উটি–তে পৌছাত। সকালে ঘুম ভাঙলো বাসে বসেই। নিচে তাকিয়ে দেখি ছোট ছোট পাহাড় যা দেখা যায় তা আকাশের শাদা মেঘে পুরোটাই ভেসে বেড়াচ্ছে। এ যেন এক শাদা মেঘের ভেলা।

বাস থেকে নামলাম। হাত দিয়ে শাদা কুয়াশার মতো মেঘ স্পর্শ করলাম। কি যে ভালো লেগেছিল বোঝানো যাবে না! আমার লেদারের জ্যাকেট নষ্ট হয়ে গেল। এতো উচুতে উঠেছি যে নিচে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

দশ রুপি দিয়ে টিকেট কেটে তামিলনাড়ু টেলিস্কোপ হাউস থেকে নিচের দৃশ্যাবলী দেখলাম। চারদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সত্যি এ যেন এক স্বপ্নের রাজ্য। পাহাড়ের ঘা ঘেষে রাস্তা বানানো। যখন টুরিস্ট বাস আমাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থান নিয়ে যাচ্ছে তখন বাসে বসে নিচের দিকে তাকালে পিলে চমকে যায়। যদি বাস কোনো মতে পড়ে যায়, কিছুই আর খুজে পাওয়া যাবে না।

ছোট–বড় সমস্ত পাহাড়েই চা বাগান। সেখানে এক হিন্দি সিনেমার শুটিং দেখলাম। শুনলাম পচানব্বই শতাংশ হিন্দি সিনেমার শুটিং নাকি ওখানেই হয়ে তাকে। *দিওয়ানা, সাজন, যব পেয়ার কিসিসে হোতা হ্যায়, ইশক*–সহ অমিতাভ বচ্চনের বিখ্যাত সিনেমা *শোলে*–ও সেখানেই হয়েছে। আমরা শোলে সিনেমার সেই বিশাল রাজবাড়িটিও দেখলাম। আরো আছে নায়ক মিঠুন চক্রবর্তীর এক বিশাল আবাসিক হোটেল। বছরের প্রায় ছয় মাস তিনি তার উটি–র এ হোটেলেই নাকি কাটান। উটি থেকে ফেরার পথে মহিশূর দেখে এলাম।

*দি সোর্ড অফ টিপু সুলতান*খ্যাত সেই টিপু সুলতানের রাজবাড়ি যা এখন মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাড়ির সামনে এক মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে চন্দন কাঠের জিনিসপত্র। টাকা কম থাকায় ছোট দুটো পুতুল কিনলাম। ফিরে এলাম ব্যাঙ্গালোরে।

পরদিন আমির খান ও রানী মুখার্জির *গোলাম* সিনেমা মুক্তি পেল। যদিও তখন রানী মুখার্জিকে আমি চিনতাম না। দেখলাম গোলাম সিনেমাটি।

এবার দেশে ফেরার পালা। ২৫ জুন ব্যাঙ্গালোর স্টেশন তেকে আবার করমন্ডল এক্সপ্রেসে করে হাওড়া স্টেশন এসে নামলাম। এবং ৩০ জুন ঢাকায়।

বর্তমানে আমার সে বন্ধু লন্ডনে আছে। ব্যাঙ্গালোর থেকে এমবিএ করে এসেছে। আজ আমরা দুজন দুই প্রান্তে। কিন্তু সেই ছবিগুলো আছে স্মৃতি হয়ে, থাকবেও অনেক দিন। তার কাছে কৃতজ্ঞ। কারণ তার জন্য দেখা হলো ইনডিয়ার অনেক কিছু।

পূর্ব বাড্ডা, ঢাকা থেকে

অনুভবে সে

- মোজাফফর আহমদ দুলু

বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আমার গায়ে একটি সার্টিফিকেট লেপটে আছে। তা হলো ভালো ছেলে। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোনো মেয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেম আলাপ করার সাহস হয়নি সার্টিফিকেট হারানোর ভয়ে। তাছাড়া সহপাঠী বন্ধুরা নিজ নিজ বান্ধবীদের পেছনে যে পরিমাণ সময় ও পয়সা ব্যয় করতো তার সামর্থও আমার ছিল না।

১৯৯৮ সালে অপ্রত্যাশিতভাবে মোটামুটি ভালো এবং সম্মানজনক বেতনের চাকরি নিয়ে সংযুক্ত আরব এমিরেটস–এর অন্যতম স্টেট দুবাই–এ এলাম। এশিয়াতে যে কয়েকটি দেশ ইওরোপের সঙ্গে টেক্কা দেয়ার

প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, দুবাই তার অন্যতম। বিলাসিতা আর নিরাপদ ফুর্তি করার অবারিত সুযোগ এখানে বিদ্যমান।

এখানে এসেও সে ঘোড়া রোগ আমাকে পেয়ে বসলো। একটি মাদ্রাজি কৃশ্চিয়ান কাপলের সাবলেট হিসেবে থাকার সময় পাশের রুমমেট ছিল তিনটি ফিলিপিনো মেয়ে। কমন বাথরুম এবং কমন কিচেন ছিল। তবে রুম নেয়ার সময় মাদ্রাজি মহিলা বলে দিয়েছিল, ভালো ছেলে মনে হচ্ছে। তাই রুম দেয়া হলো। কিন্তু পাশের রুমের মেয়েরা কিচেনে থাকলে বা বাথরুমে গেলে রুম থেকে বের হওয়া যাবে না।

রান্না করতাম না। বাথরুমের কার্যাদি পাশের রুমের মেয়েরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই সেরে ফেলতাম। আমার অফিসের সঙ্গে ওই বাসাটির যোগাযাগ ব্যবস্থা ভালো ছিল। তাই সেখানে দীর্ঘ চোদ্দ মাস ছিলাম। কিন্তু কখনো সে তিন মেয়ের চেহারা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি।

উল্লেখ্য, তাদের কর্ম ঘণ্টা আমার চেয়ে ভিন্ন ছিল। এবং তাদের সাপ্তাহিক ছুটিও ছিল না। তবে তাদের জন্মদিনে, কৃসমাস ডে-তে তাদের পক্ষ থেকে কেক, চকলেট পেতাম মাদ্রাজি কাপলের মাধ্যমে।

আমাদের ঈদের দিনে *হ্যাপি ঈদ ডে* লিখে আমার দরজায় লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রাপ্য ধন্যবাদটুকু দেয়া সম্ভব হয়নি।

এভাবে যন্ত্রের মতো দিন যাচ্ছিল।

এ বছরের শুরুর দিকে স্বদেশে গিয়েছিলাম। বাবা-মা চিরবিদায় নিয়েছেন আমি এবার বাংলাদেশ যাওয়ার আগে। তিন বোন মিলে চেষ্টা করেছে বিয়ে করানোর জন্য। কিন্তু যে কয়েকটি মেয়ের প্রাথমিক খোজখবর নিয়ে পারিবারিকভাবে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল তাদের অভিভাবকদের কারো কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যায়নি। অবশ্য আমাদের কাছেও কিছু প্রস্তাব এসেছিল যা গ্রহণযোগ্য ছিল না। কারণ আমি মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসী। তাদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের বাংলাদেশিরা সুইপার কিংবা কনস্ট্রাকশন শ্রমিকের কাজ করে মাত্র। তারা নিয়মিত দেশে আসতে পারে না। আমার ব্যাপারে না হলেও তাদের ধারণা এক অর্থে সত্য।

আমাদের দেশের শিক্ষিত ছেলেরা যারা বিদেশ যেতে ইচ্ছুক তারা কখনো দুবাই কিংবা মধ্যপ্রাচ্যকে বিবেচনায় আনে না। বাংলাদেশি যারা মধ্যপ্রাচ্যে আসে তাদের শতকরা পচানব্বই ভাগ হয়তো অর্ধশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত। আবার শিক্ষিত হলেও ইংরেজি কথা বলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার কারণে কায়িক শ্রমের কাজ করতে বাধ্য হয়। অথচ সুশিক্ষিত লোকদের জন্যও এখানে কাজের সুযোগ আছে যার পুরোটাই ইনডিয়ানদের এবং কিছু অংশ পাকিস্তানি ও ফিলিপিনোদের কব্জায়।

এবার চলে আসার প্রাককালে একটি মেয়েকে খুব বেশি পছন্দ হয়েছিল। কারণ মেয়েটি কথাবার্তায় স্মার্ট এবং মেধাবী ছিল। সে আগে থেকে আমার বোনের বাসায় আসতো। আমাকে দেখেছে এবং আমার সম্পর্কে জানে। প্রথমে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আমাকে তার পছন্দ কি না।

সে হ্যা বলার পর ব্যক্তিগতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম এবং পরামর্শ দিলাম আরো কয়েকদিন গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য।

তিন দিন পর বললো, সে রাজি আছে।

যেহেতু মেয়েটির পারিবারিক স্টেটাস আমাদের চেয়ে কম ছিল। তাই আমরা ধরে নিয়েছিলাম মেয়েটি রাজি হলে অভিভাবক মহলও রাজি হবে। যথানিয়মে পারিবারিকভাবে প্রস্তাব পাঠানো হলো।

কিন্তু সামাজিক প্রথা অর্থাৎ তার একটি বড় বোন অবিবাহিত থাকায় অভিভাবক মহল যেন কথা বলতেও রাজি হলেন না।

ইতিমধ্যে মেয়েটির সঙ্গে কয়েকবার কথা বলে তার এক্সট্রা কিছু গুণাবলী আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছিল। ফলে তাকে পিতা-মাতার সামান্য অবাধ্য হওয়ার প্রস্তাব দিলাম। দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলাম, মেয়েটিও আমাকে পেতে ইচ্ছুক।

বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিকতা, অর্থাৎ আমাকে অবাক করে দিয়ে বললো, পিতা মাতার কথার বাইরে এক বিন্দুও সে নড়তে পারবে না।

একজন মহিলা লিখেছিলেন, আমাদের দেশে অনেক মহিলা দাম্পত্য জীবনে স্বামী কর্তৃক ধর্ষিতা হয়। আমার প্রশ্ন, এটার জন্য কি আমাদের নারী সমাজ কিছুটা হলেও দায়ী নয়?

এখনো মেয়েটিকে খুব অনুভব করি। কখনো ইচ্ছা হয় কিডন্যাপ করে বিয়ে করবো। কিন্তু সে হয়তো ভুল বুঝবে। তাই সে রকম কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

ব্যস্ততার ফাকে, কখনো বিছানায় শুয়ে মেয়েটিকে খুব মনে পড়ে। এবং অপ্রাপ্তির বেদনা মনকে গ্রাস করে। কখনো দুই চোখের কোণা বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। জানি না এর নাম ভালোবাসা, নাকি অন্য কিছু?

দুবাই থেকে

চকবার আইসকৃম

- লিজা রহমান

আমি ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রী। দেখতে আহামরি সুন্দরী নই। কিন্তু একেবারে খারাপও নই।

আমার প্রিয় খাবার চকবার আইসকৃম।

আমি একটি কুৎসিত, বিশ্রী চামচিকার মতো ছেলেকে ভালোবাসি। শুধু ভালোবাসি বললে ভুল হবে, খুব বেশি ভালোবাসি। ভালোবাসারও তো একটা সীমা আছে। কিন্তু আমি তাকে এমনি ভালোবাসি যার কোনো সীমানা নেই।

আমার মাঝে মধ্যে দারুণ রাগ হয়, কেন যে আমি এতো ভালোবাসি। এই জঘন্য ছেলেটার নাম খসরু। তার সঙ্গে পরিচয় এসএসসি-র টেস্ট পরীক্ষার সময়। কল্পনাও করিনি এই হাবলু মার্কা ছেলের সঙ্গে আমার মতো একটা মেয়ে প্রেম করবে!

একটা গোপন কথা বলি আপনাদের। আসলে খসরুকে যতোই কুৎসিত বলি, সে মোটেও কুৎসিত নয়। খসরু দেখতে খুব সুন্দর। বেশি সুন্দর। তাই তাকে কুৎসিত বলি। তার সৌন্দর্যের কাছে বাংলা সিনেমার সব নায়ক ফেল এটা শতকরা এক হাজার ভাগ গ্যারান্টি দিতে পারি। একটা মেয়েকে কাবু করার মতো সব রকম গুণই তার আছে।

আমার কাছে আইসকৃম যেমন প্রিয়, খসরুও ঠিক ততোখানি প্রিয়।

খসরু আমার কাছে আসলে মনে হয় যেন চকবার আইসকৃম আমার সামনে দাড়িয়ে আছে।

ইচ্ছে করে টপ করে ধরে খপ করে খেয়ে ফেলি।

তাকে যেমন ভালোবাসি তেমন ঘৃণাও করি। কারণ যাকে বেশি ভালোবাসা যায় তাকে ঘৃণাও করা যায়। খসরু আমার কাছে এলে মনে হয় আকাশের চাদ হাতে পেয়েছি।

আমার সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত কোনটি জানেন! খসরু যখন আমার কাছে এসে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেয় আমার সারা শরীরে তখন মনে হয় এই পৃথিবীতে বুঝি আমার চেয়ে বেশি সুখী অন্য কেউ নেই। সবচেয়ে কষ্টের মুহূর্ত হচ্ছে, খসরু যখন আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় তার কর্মক্ষেত্রে তখন মনে হয় আমিই পৃথিবীতে সবচেয়ে দুঃখী।

আমি প্রতি ওয়াক্তে নফল নামাজ পড়ি তার জন্য যাতে করে তার কোনো বিপদ–আপদ না আসে। সৃষ্টিকর্তার কাছে একটা জিনিসই চাই যা না পেলে মরে গিয়েও শান্তি পাবো না। আমি চাই বৌ হতে। শুধু খসরুর বৌ হতে।

সামনে ঈদ। ঈদ মানে খুশি, আনন্দ। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে ঈদ আনন্দ নয়। কারণ এই দিনে খসরু আমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকবে। খসরু চলে যাবে তার নিজের বাড়িতে। আমি থাকবো একা শুধু তার অপেক্ষায়।

খসরু, আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো। তাই ফিরে এসো তাড়াতাড়ি। আমার ভালোবাসা দিয়ে তোমায় বরণ করে নেবো।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা, আপনারা দোয়া করবেন এই ঈদে না হোক, পরের ঈদগুলো যেন আমরা এক সঙ্গে কাটাতে পারি সারা জীবন। আমরা দুজন যেন হতে পারি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দম্পতি।

গাজীপুর থেকে

আরব দেশে

- সায়ফুল ইসলাম

মুসলিম আরবের অনুকূল এবং ইওরোপের ভিন্ন প্রকৃতি ও প্রতিকূল পরিবেশে ঈদ উদযাপনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও অর্জন করেছি। সর্বত্র সুশোভিত মসজিদ আর অসংখ্য ঈদগাহ গড়ে উঠেছে আজ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোতে।

ইওরোপের কয়েকটি দেশে ভ্রমণকালে সেখানের প্রধান শহরগুলোর অলিতে–গলিতে হাজারো গির্জার সাক্ষাৎ মিললেও মসজিদের সন্ধান মিলেছে হাতেগোনা কয়েকটি। তবে এসব মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের নিত্য সমাগম লক্ষণীয়।

আজকাল ইওরোপিয়ান ওই সব গির্জায় কখনো কোনো রবিবারে গুটিকয়েক বয়োবৃদ্ধ প্রার্থনাকারী এবং কেয়ারটেকার ছাড়া তেমন কারো আনাগোনা লক্ষ্য করা যায় না। তবে এসব প্রাচীন গির্জার অসাধারণ কারুকাজ ও নান্দনিক গঠনশৈলী যুগ যুগ ধরে পর্যটকদের আকর্ষণ করে চলেছে।

সামার সিজনে ইওরোপিয়ান পর্যটকরা তাদের পোশাক–আশাকে পর্যাপ্ত কাটছাট করে নেয়। ওই সংক্ষিপ্ত পোশাকেই তারা গির্জার ভেতরে ঢুকে পড়ে। এই ধরনের দর্শনার্থীদের জন্য গির্জার প্রবেশ পথে কিছু চাদর বা বড় টাওয়েল ঝোলানো আছে। পাশে টানানো বিজ্ঞপ্তিতে লেখা রয়েছে, গির্জার পবিত্রতা রক্ষার্থে বিকিনি বা শর্টস জাতীয় ক্ষুদ্র বসনে গির্জায় প্রবেশ করবেন না। অনুগ্রহপূর্বক একটি চাদর বা টাওয়েল জড়িয়ে নিন।

এক ঈদের দিন বিকেলে ইটালির ভাসন্ত শহর ভেনিসে নদী পাড়ের বেঞ্চিতে নৌকা বাইচ দেখার আগ্রহে বসে পড়লাম।

পাশে এসে বসলেন এক ইটালিয়ান ভদ্রলোক। জানতে চাইলেন আমি ইনডিয়ান কি না।

বললাম, না, আমি বাংলাদেশি।

এরপর ভদ্রলোক গল্প জুড়ে দিলেন। তিনিও ভ্রমণ বিলাসী। একাধিকবার ইনডিয়া সফরে গেছেন তিনি। বিশেষত কলকাতার ব্যস্ততম জীবনযাত্রা তার খুব ভালো লেগেছে। ঢাকায় যেতে তিনি একান্ত আগ্রহী ছিলেন, প্রস্তুতিও ছিল তার। কিন্তু কলকাতার লোকেরা তাকে নিরুৎসাহিত করে বলেছে, ঢাকা সন্ত্রাসী আর খুনখারাবির শহর। বিদেশিরা সেখানে মোটেও নিরাপদ নয়।

সেই আতংকে তিনি আর ঢাকা যেতে সাহসী হননি।

ভদ্রলোককে আপ্রাণভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে, তাকে দেয়া এই তথ্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। ঢাকায় প্রচুর বিদেশি পর্যটক নিত্যদিন নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আশ্বস্ত হয়ে তিনি পরবর্তীকালে ঢাকা সফরে যাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ সম্পর্কে ইনডিয়ানদের এমন উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার যেমন নতুন নয় তেমনি এতে অবাক হবারও কিছু নেই। আমাদের কিছু স্বনামখ্যাত (?) নেতানেত্রীই তো বিদেশ চষে দেশে আল কায়েদা আর সন্ত্রাসীতে ছেয়ে গেছে বলে জোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন।

একবার ভূমধ্যসাগরীয় ছোট দেশ মল্টায় ছুটি কাটাচ্ছিলাম। এ বিকেলে একটি ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে গেলে এক মল্টিজ আমাদের নাগরিকত্ব জানতে চাইলেন।

আমরা বাংলাদেশি বলতেই সোৎসাহসে বলে উঠলেন, ও হ্যা, আমি বাংলাদেশের নাম শুনেছি। সে দেশে প্রায়ই ঝড়-ঝঞ্ঝা আর প্রবল বন্যা হয়ে থাকে। আমাদের টিভিতে প্রায়ই সেই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের করুণ ছবি দেখানো হয়।

ভদ্রলোকের কথা শুনে ভাবলাম বান-বন্যার এটাও হয়তো একটা কল্যাণকর দিক। অন্তত এর সুবাদে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পরিচিতি তো বাড়ছে! আমাদের নাম জানতে পারছে বিশ্ববাসী।

কথা প্রসঙ্গে আরেক মল্টিজ আমাদের ছোট দেশের বিশাল জনসংখ্যার কথা শুনে চোখ কপালে তুলে বললেন, তোমাদের এতো ছোট আয়তনের দেশে এতো লোকের স্থান সংকুলান হচ্ছে কি করে! তারা কোথায় কিভাবে ঘুমায়? তোমাদের ঘরের খাটগুলো কি সব দোতলা, তিন তলা অর্থাৎ একটার উপরে আরেকটি রাখা?

বললাম, না, মোটেও তা নয়। আমাদের দেশের ঘরগুলোই সব দোতলা তিন তলা। ফলে ঘুমাতে কারো সমস্যা হয় না। তাদের টিভিতে আবার কখনো বন্যার ছবি দেখানো হলে ভদ্রলোক হয়তো এর সত্যতা খুজতে চেষ্টা করবেন।

সউদি প্রবাসীদের অনেকেই ঈদের এ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ছুটিতে পবিত্র মক্কা-মদিনা জিয়ারতের সুযোগ নেন। গত ঈদে মদিনার মসজিদে নববীর বিশাল ঈদ-জামায়াতে শামিল হতে বন্ধু বাশার পরিবারসহ আমরা জেদ্দা ছাড়ি।

চারশ কিলোমিটারের এই দীর্ঘ যাত্রাপথটি ছিল ঈদের তাৎপর্য, আলোচনা আর ঈদের গানের সমন্বয়ে আনন্দমুখর। মিসেস বাশার গাড়ির পেছনের ট্রাংকে তার কিচেনের প্রায় অর্ধাংশ উঠিয়ে নিয়ে ছিলেন। মদিনায় এপার্টমেন্টে উঠেই তিনি স্পেশাল রান্না-বান্নার আয়োজন করে ঈদের বর্ধিত আনন্দের যোগান দেন।

আমার বাসার কাছে আল-সালামা ডিস্ট্রিক্টের সুপরিচিত *আল-শোয়াইবি* মসজিদটি। এখানে ঈদের সুবিশাল জামায়াতে সউদির একজন বিখ্যাত আলেম ও বাগ্মী শেখ আবদুল্লাহ আলী বাসপার ইমামতি করে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, তিনি কিছু দিন আগে একটি সউদি উলামা প্রতিনিধি দলের বাংলাদেশ সফরে নেতৃত্ব দেন। সফর শেষে এই শোয়াইবি মসজিদে জুমার এক বিশাল জামায়াতে বাংলাদেশে তার সফর অভিজ্ঞতার নানান দিক তুলে ধরে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ খুতবা দেন। সফরকালে বায়তুল মোকাররম মসজিদে তিনি এক জুমায় ইমামতিও করেছিলেন। নামাজান্তে তাদেরকে এক নজর দেখার জন্য মুসল্লিদের উপচে পড়া প্রচণ্ড ভিড় এড়িয়ে মসজিদের বাইরে আসতে তাদেরকে পুলিশের সহায়তা নিতে হয়েছিল বলে তিনি খুতবায় উল্লেখ করেন। এভাবে তাদের প্রতি বাংলাদেশি মুসলমানদের প্রাণঢালা ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখে তিনি অভিভূত হন বলেও মুসল্লিদের জানান। এ খুতবায় মসজিদে উপস্থিত সউদিয়ানদের প্রতি বাংলাদেশিদের যাবতীয় সহায়তা দানের আবেদনও জানান তিনি। তার সুললিত কণ্ঠের তেলাওয়াত আর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য শোনার জন্য প্রতিটি জুমায় শোয়াইবি মসজিদটি কানায় কানায় ভরে উঠে।

আমার এবারের ঈদের ভেনু আর মেনু এখনো ফাইনালাইজড হয়নি। তবে হয়তো বা কাছের শোয়াইবি মসজিদেই কেটে যাবে এবারের ঈদ এক কাপ চা আর এক বাটি নিরস সেমাই দিয়েই।

সউদি আরব থেকে

মেঘলা আকাশ

লস এঞ্জেলসের হাইল্যান্ড পার্কের সারি সারি পাম ট্র শোভিত থৃ নাইনটি নর্থ এভিনিউ ফিফটি সেভেনথের বাসা থেকে যখন সকাল সাতটায় বের হই কানেকটিং ফ্লাইটে নিউ ইয়র্ক পৌছার জন্য তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি ওখানে আর ফিরে যাচ্ছি না। অথচ আমার নিজের হাতে সাজানো সংসার যার প্রতি আমার একরাশ মমতা। এক সপ্তাহ ধরে সব কিছু গুছিয়ে রেখেছি যাতে ফিরে গিয়ে বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে না হয়।

আমার অতি শখের কিছু প্লান্ট যেগুলোতে পানি দিয়ে যত্ন করে রেখে এসেছি এবং এক আত্মীয়কে বলে এসেছি মাঝে মধ্যে গিয়ে গাছগুলোতে পানি দেয়ার জন্য। তবুও দুশ্চিন্তা, পাচ সপ্তাহে না আমার গাছগুলো শুকিয়ে যায়, অথচ এক অবিশ্বাসীর কুটিল শঠতায় আজ কতো পাচ সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে, পড়ে আছি সহস্র যোজন দূরে।

আমার স্বামী যাকে আমি সর্বান্তকরণে ভালোবাসি তাকে সরল মনে বিশ্বাস করেছিলাম। আমার সরলতার সুযোগে সে এক হীন চক্রান্ত করলো। চক্রান্ত করে আমাকে দেশে এনে তার পরিবার নামের এক নরকপুরীতে ফেলে রেখে চলে গেল যেখান থেকে পালানোর কোনো উপায় নেই। সে জানতো আমি দেশে আসতে চাইছি না।

আমি আসতে চাইনি। কারণ আমার পিঠাপিঠি তিন বাচ্চা যাদের বয়স তখন তিনের উপরেও যায়নি। এই ছোট বাচ্চাদের নিয়ে দেশে এসে কষ্ট হবে ভেবে আসতে চাইনি। স্বামী তখন তার বোনের বাসা থেকে যাতে আমি বুঝতে না পারি, দেশে তার বাবার কাছে কল করে বলে, আমি আসতে চাচ্ছি না। তার বাবা যেন আমার সঙ্গে কথা বলে আমাকে রাজি করান। এসব আমি দেশে আসার পর জানতে পারি তাদের পরিবারেরই একজনের কাছ থেকে।

পরে তার বাবা আমার কাছে ফোন করে আমাকে অনেক বোঝালেন। কেদে কেদে বলেন, তিনি তার নাতি-নাতনিদেরকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন। এবং পাড়া-পড়শিদের কাছে ইতিমধ্যে বলেও ফেলেছেন যে, তার ছেলে, বৌ, নাতি-নাতনিরা আসছে। এখন আমি না এলে তার খুব খারাপ লাগবে।

তার কান্নাকাটি শুনে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যাই। অথচ এসবই ছিল তাদের পিতা-পুত্রের চক্রান্তের অংশ।

আমার শুধু দুঃখ হয় আমার স্বামী কেন আমার সঙ্গে এতো শঠতা করতে গেল। এমন নয় যে, তার সঙ্গে আমার বড় ধরনের কোনো সংঘাত ছিল। দাম্পত্য জীবনের ছোটখাটো মনোমালিন্য, কথা কাটাকাটি এই যা। এটুকুও তার সহ্য হচ্ছিল না। গলার কাটা না পারছে গিলতে আর না পারছে ফেলতে। বাচ্চাদের মুখ চেয়ে ডিভোর্স দিল না। উর্বর মাথা থেকে নিষ্ঠুর এক উপায় বের করে বাচ্চাদেরসহ আমাকে দূরে সরিয়ে দিল।

তাদের নির্মমতার এখানেই শেষ নয়। আমার নিজের বাচ্চা, অথচ তাদের নিয়ে আমার বাবার বাড়িতেও যেতে পারি না। তারা আমার বাচ্চাদেরকে নিতে দেয় না। আমার স্বামী নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গেছেন। আমার শ্বশুর সেটা খুব কার্যকরভাবেই পালন করেন। আমার শ্বশুর আমাকে দুই চোখে দেখতে পারেন না। প্রকাশ্যেই বলেন শুধু নাতি-নাতনিগুলো ছোট বলেই দয়া করে আমাকে রেখেছেন। না হলে কোনদিন লাথি মেরে বিদায় করে দিতেন।

এই হিংস্র পরিবারে শুধু একজন যাকে মনে মনে এনজেল বলে ডাকি। সে এ পরিবারের একজন হয়েও আমার বন্ধু, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, আমার এক টুকরো ভালো লাগা, যার জন্য মনে হয় এখনো নিঃশ্বাস নিতে পারছি। না হলে এ নরকপুরীতে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়েই মারা যেতাম। তবুও এই অনিশ্চিত জীবনের পথ চলায় তার হাতকে আকড়ে ধরতে পারবো না। কারণ তাতে কলংক হবে।

আমার এই নিষ্পাপ উপকারী বন্ধুটিকে কলংকিত করতে চাই না। তাকে অনেক ভালোবাসি। শুধু প্রত্যাশা, জীবন যদি থমকে দাড়ায়, জ্যোৎস্না বিবর্ণ হয়, আকাশের সব নীল মেঘে ঢেকে যায়, জীবনে যদি ঘটে পরাজয়, তবু বন্ধুত্বের যেন জয় হয়।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

বাসর ঘরের অপেক্ষায়

- অনামিকা

জীবনের বিশটি বসন্ত পেরিয়ে এসে আজকাল উপলব্ধি করছি যে, অনেক ছোটবেলায়ই আমি পেকে গিয়েছিলাম। ফলে মাত্র বারো বছর বয়সেই একজনকে মনে-প্রাণে ভালোবেসেছিলাম। যাকে এতো ভালোবেসেছিলাম সে আর কেউ নয়, আমারই গৃহ শিক্ষক। আমি যে তাকে ভালোবাসি এ কথা বলার জন্য আমার মনটা সারাক্ষণ আকুলি-বিকুলি করতো। যদিও আকুলি-বিকুলি শব্দটাও তখন জানতাম না। অর্থাৎ সারাক্ষণ একটা ছটফটানির ভেতর কাটতো আমার সময়গুলো।

সেই ঝড়-ঝঞ্ঝাময় আমার দুঃসময়ে আমার টিচার আমাকে প্রেমের প্রস্তাব দিল। দিল কিভাবে? একটা চিঠিতে তার আবেগ ভরা মধুর কথাগুলো আমাকে জানালো। বললো, তোমার ওই গভীর কালো চোখের দিকে তাকালে আমি যেন চলে যাই অন্য এক ভুবনে।

একেবারে ঠাসা মিথ্যা কথা! তখন কি আর এটা বুঝতাম যে, শালা সিনেমার ডায়ালগ মারছে।

যাই হোক। আমি তো তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছিই, এবারে একেবারে অতলে তলিয়ে গেলাম।

আমিও তাকে পাল্টা চিঠি দিলাম। কি লিখেছিলাম এবং পরবর্তী প্রত্যেকটা চিঠিতেই বা কি লেখা হতো এখন তা আমার কিছুই মনে নেই। আমাদের প্রেম এ চিঠির মধ্যেই সীমাবদ্ধ যেখানে আমি নায়িকা, এক পূর্ণ যুবতী এবং সে এক পরিপূর্ণ পুরুষ। আমি ছিলাম তার বুক পর্যন্ত। তাই বোধহয় আমাকে চুমু খেতে তার একটু কষ্টই হতো।

কিন্তু আমি...!

সে যখন তার দুটি হাত দিয়ে আমার ঘাড়সহ পেছনের চুলগুলো বুলিয়ে দিতে দিতে চুমু খেত আমার গলায়, ঠোটে, গালে, তখন কি যে ভালোলাগায় আচ্ছন্ন হয়ে যেতাম আমি সেটা তখন ভালো করে না বুঝতে পারলেও এখন উপলব্ধি করতে পারি সবটুকু। সে যখন একটা একটা করে আমার টপসের বোতামগুলো খুলে ও দুটি তার মুঠিতে পুরে নিতো এবং চুমুতে চুমুতে ভিজিয়ে দিতো, আমার সম্পূর্ণ বুক তখন কেমন করে সইতাম, সে কথা ভুলে গেছি আজ।

যদি বলতে পারতাম তাহলে বোধহয় এতোটা কষ্ট হতো না যতোটা আজ হয়।

সে আমার পা থেকে উরু এবং নাভী থেকে কপাল সমস্ত জায়গাতেই তার ঠোটের লালা মিশ্রিত উষ্ণতা দিয়ে আমাকে পাগল করে ফেলতো। মাঝে মধ্যে আমি এক বিশেষ অভিনবত্বে বলতাম, আহ...!

এতো দিনে ভুলে গেছি খুব সুখের, নাকি কষ্টের বহিঃপ্রকাশ এটা!

প্রায়ই সে আমার ভেতরে চলে যেতো চাইতো। কিন্তু আমি নিশ্চয়ই বুঝতাম বা ভয়েই নিষেধ করতাম যে, এটা এখন না। বাসর রাতের জন্য সঞ্চিত রেখে দাও। না হলে ওই দিন কি করবে, আঙুল চুষবে? সবই তো পুরনো মনে হবে।

সে বলতো আরে পাগলি! ভালোবাসা কি কখনো পুরনো হয়। তুমি আমার কাছে প্রতিদিনই নতুন। নতুনই থাকবে যতোগুলো দিন আসবে আমার জীবনে।

এতো বড় কথার অর্থ বুঝতাম না। শুধু বলতাম, তুমি যদি আমাকে, শুধু আমাকে ভালোবাসো তবে এটা চাইবে না কখনো, প্লিজ!

সে আর জোর করেনি।

তারপর একদিন হঠাৎই সে পাড়ি জমায় প্রবাসে।

তারপরে এতো দিনের গ্যাপ এবং আজকের লেখা।

এই পর্যন্ত আমার কাহিনী।

তবে এখনো বিশ্বাস করি, সে আসবে।

এসে বলবে, লক্ষ্মীটি দেখো, আমি এসেছি। এবারে বাসর ঘরেই তোমাকে চাইবো, তখন না করতে পারবে না।

বটতলা, টাঙ্গাইল থেকে

উপহার

- এএসএম পলাশ

২০০০ সাল। চিঠির মাধ্যমে পরিচয় হয় নড়াইলের এক তরুণীর সঙ্গে। তার সত্যিকার নাম হলো নূপুর। তবে আমাকে লিখেছিল উর্মি নাম দিয়ে। কাজেই উর্মির সঙ্গেই শুরু হয় চিঠির আদান-প্রদান। পরিচয় থেকে বন্ধুত্ব, তারপর প্রণয়। কয়েক মাস পর সে জানায় তার আসল নাম নূপুর।

বিষয়টি সহজভাবে নিই। ধীরে ধীরে আমরা পরস্পরের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ি। তখন পর্যন্ত আমরা কেউ কাউকে দেখিনি। তবে টেলিফোনে কথাবার্তা চলতো।

একদিন সে বললো, তার বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে। তাই আমাকে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানাতে বললো।

এদিকে আমার পড়ালেখা শেষ হয়নি। অনার্স ফাইনাল ইয়ার চলছে। মাস দুয়েক পরই পরীক্ষা। এ অবস্থায় বাসায় বিয়ের কথা বলা অসম্ভব। অন্যদিকে প্রিয় মানুষটিকে হারানোর ভয়। শেষমেষ বাসায় জানালাম।

বাবা তো ক্ষেপে আমাকে কাছে পেলে তেড়ে আসবেন এমন অবস্থা। দাদা-দাদির হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি আমার অনুকূলে আসে।

দিন ঠিক করে দাদাকে নিয়ে গেলাম নড়াইলে। নূপুরের বাবা-মা আমাকে পছন্দ করেন। কথা হয় আমার অনার্স পরীক্ষা শেষে বিয়ে হবে।

কথা অনুযায়ী এক লাখ এক টাকা দেনমোহরে নূপুরের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে যায়। এদিকে বড় আত্মীয় থাকার সুবাধে ঢাকার একটি ফার্মে চাকরি হয়ে যায়। নূপুরের অন্যান্য সব আত্মীয়স্বজনরা ঢাকাতেই থাকে। ফলে সেটলড হতে সুবিধা হয়।

নূপুরের খালার বাড়ির পাশেই একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিই। অফিসের কাজে প্রায় রাত হয়ে যেতো বাসায় ফিরতে। তবে নূপুরের সময় কাটানোয় সমস্যা হতো না। কিন্তু ঘটনা যা ঘটতে লাগলো তা সবই আমার অগোচরে।

নূপুরের খালাতো ভাই জিকো প্রায়ই আমার বাসায় যেতো। বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিলেও তার আচরণে মাঝে মধ্যে খটকা লাগতো। বয়সে সে আমার সমান। সেও একটি বেসরকারি ফার্মে কাজ করে।

একদিন হঠাৎ দেখি তারা দুজনে রিকশায় ধানমন্ডি লেকের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সেখানে কম্পানির একটি জরিপের কাজ করছিলাম। ফলে মনে সন্দেহ দানা বাধে।

ইদানীং নূপুরের আচরণে আমার সন্দেহ হয়। এ নিয়ে তার সঙ্গে কোনো কথা বলিনি। শুধু বলেছিলাম, জিকোর অফিসে গিয়ে দেখি সে নেই।

এতে নূপুরের কপাল দিয়ে ঘাম ঝরে। সে অস্থিরতা প্রকাশ করে।

আমার সন্দেহ আরো বেড়ে যায়। একদিন অফিসে ছুটি নিয়ে দুপুরে বাসায় ফিরে দেখি জিকোর কোলে নূপুর। জিকো আমার প্রিয়তমাকে নিয়ে ইচ্ছা মতো খেলছে।

আমি সরাসরি ঘরে ঢুকে পড়ায় তারা উভয়ে আতকে ওঠে।

সেদিন রাতে নূপুরের সঙ্গে আমার তুমুল কথা কাটাকাটি হয়। প্রচণ্ড রাগে নূপুরের গায়ে হাত তুলি।

পরের দিন নূপুর তার খালাতো ভাই ও তার বন্ধুদের দিয়ে প্রচণ্ড হুমকি দেয়। কয়েকদিন পরই ঈদ। কথা ছিল এবার নূপুরকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি যাবো। কিন্তু পরের দিন আমাকে একাই গ্রামের বাড়ি যেতে হলো। নূপুরকে বোঝানোর চেষ্টা করেও কোনো লাভ হয়নি।

কয়েকদিন পর অর্থাৎ ঈদের একদিন আগে নূপুরের চিঠি এবং তালাকনামা।

চিঠিতে সে জানায়, পলাশ, তোমাকে ভালো লেগেছিল, তাই বিয়ে করেছিলাম। এবং এখন ভালো লাগে না, তাই তালাক দিচ্ছি। সম্ভব হলে আমাকে ক্ষমা করো এবং কাউকে খুজে নিও।

নূপুর খুবই একরোখা টাইপের। কাজেই আমার আর কিছুই করার ছিল না।

ভাবনাগুলো স্মৃতিতে এলেই বুকটা কেমন যেন মোচড় দিল। যার জন্য এতো কিছু করলাম, আজ সেই ফাকি দিল!

ঈদের উপহার মনে করে কষ্টগুলো বুকের মাঝে পাথর চাপা দিলাম। ঈদের পর অফিসে রিজাইন দিয়ে রাজশাহী চলে এলাম। আবার ভর্তি হলাম রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে মাস্টার্সে। গত দুই বছর আমার জীবনে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। কিন্তু জীবন কখনো থেমে থাকে না। তবে স্মৃতিও মুছে যায় না।

নূপুরের একটি কথা আজো মনে আছে, অনেক কিছুই হওয়া উচিত নয়, তারপরও তো হয়।

সামনে আসছে আবার ঈদ। এখন নিজেকে অনেক হালকা মনে হচ্ছে।

কেশবপুর, রাজশাহী থেকে

সেহেরি

- রাফি তালুকদার

আমি তখন ছোট। বয়স আনুমানিক আট নয় বছর হবে। বাড়িতে সবাই রোজা রাখতো। অনেকের মুখে শুনেছি, রোজা না রাখলে ঈদের আনন্দ উপভোগ করা যায় না।

একদিন মাকে বললাম, মা, আমি রোজা রাখবো।

আমার কথা শুনে মা বললেন, না বাবা, তোমার রোজা রাখার দরকার নেই, তুমি ছোট মানুষ।

বললাম, না মা, রোজা না রাখলে যে আমার ঈদ হবে না।

মা বললেন, তোমাকে কে বলেছে তোমার ঈদ হবে না? ঈদে তোমার জন্য নতুন পাজামা-পাঞ্জাবি সব কিছু কিনে দেবো, দেখবে তোমার ঈদ খুব সুন্দর হবে।

বুঝতে পারলাম, মা আমাকে বলবেন না। তাহলে কারো কাছ থেকে শোনা যায় একটু ভেবে দেখলাম। পাশের বাড়ির রুমনচাচা আমাকে খুব ভালোবাসেন, বেশ আদর করতেন, তার কাছ থেকে জানা যাবে। চাচার কাছে গিয়ে বললাম, চাচা, রোজা রাখতে গেলে কি করতে হবে।

চাচা বললেন, শেষ রাতে উঠে সেহেরি খেতে হবে, তারপর সারা দিন না খেয়ে থাকতে হবে। সন্ধ্যায় মাগরিবের আজান হলে ইফতার করতে হবে।

ওখানে আর দেরি না করে এক দৌড়ে বাড়ি গিয়ে মাকে বললাম, মা, তোমরা তো রোজা রাখো, তাই না?

মা বললেন, হ্যা রাখি।

বললাম, তাহলে তোমরা শেষ রাতে সেহেরি খাও।

মা বললেন, হ্যা খাই।

বললাম, মা, আমিও সেহেরি খাবো। আজ রাতে আমাকে ডাকবে। কিন্তু মা আমাকে কোনোদিনই ডাকতেন না।

একদিন রাতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে যায়। দেখি মা–বাবা দুজনে কি যেন খাচ্ছেন।

উঠে এসে মাকে বললাম, মা, আমাকে সেহেরি দাও।

মা আমাকে ভাত তরকারি যা ছিল সবই দিয়েছেন। কিন্তু সেহেরি দেননি। বললাম, মা, আমি এসব কিছুই খাবো না, আমাকে সেহেরি দাও।

মা বললো, এটাই সেহেরি, খাও বাবা।

বললাম, তোমরা আগেই সেহেরি খেয়ে আমাকে এখন ভাত দিচ্ছো। আমি সেহেরি ছাড়া কিছুই খাবো না।

সেদিন মা শত চেষ্টা করেও আমাকে বোঝাতে পারেননি। আমার এ জেদ থামানোর জন্য মা একটা বুদ্ধি আটলেন। পরে মা ভাতে পানি দিয়ে নিয়ে এসে বলেছিলেন নাও এটাই সেহেরি।

কোনোদিন পান্তা খাইনি। এটা আমার কাছে নতুন খাবার মনে হয়েছিল। তাই বিশ্বাস করেছিলাম এটাই সেহেরি।

পরে আর কোনোদিন সেহেরি খেতে চাইনি। কারণ সেই দিনের সেহেরি নামের পান্তা আমার ভালো লাগেনি। আমার ধারণা ছিল, সেহেরি এমন একটা খাবার যা সাধারণ খাবার থেকে আলাদা এবং যা খেলে সারা দিন না খেয়ে থাকা যাবে।

তারপর একটু বড় হওয়ার পর বুঝতে পারি সেহেরি কি।

রংপুর থেকে

ঘড়ি

- মোহাম্মদ মহসীন হায়দার শ্রাবণ

২০০২ সালের এসএসসি পরীক্ষার আগের রাত। ভাতিজা রাফিকে টিপস দিচ্ছিলাম, পরীক্ষার খাতা কিভাবে ভাজ করতে হবে, কিভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, কোন ধরনের প্রশ্নের উত্তর আগে লিখতে হবে। এক সময় বললাম, হাতের ঘড়িটা খুলে টেবিলের ওপর রাখিস। এবং প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী সময় ব্যয় করিস। পরীক্ষায় সব প্রশ্নের উত্তর লেখা হলে দশ মিনিটের সময় হাতে রাখবি। তারপর খাতাটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেক করে দেখবি কোনো রকম ভুলত্রুটি আছে কি না।

ভাতিজা বললো, আমার ঘড়ির কাটাগুলো ছোট। তাই এটা থেকে সময় দেখতে হলে ঘড়ির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। এতে আমার অতিরিক্ত সময় ব্যয় হবে।

অসুবিধা নেই। আমার ঘড়িটা নিয়ে যা। বলে আমার হাত থেকে ঘড়িটা খুলে দিলাম।

রাফি আমার আপন ভাতিজা নয়, আমার দূরসম্পর্কের ভাতিজা। আমাদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য বেশি নয়। সে আমার দুই বছরের জুনিয়র। তাই আমাদের মধ্যে সম্পর্কটাও তুই তোকারির।

পরদিন সকালবেলা ভাতিজাকে সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রের দিকে রওনা হলাম। কালো রঙের প্যান্টের সঙ্গে অ্যাশ কালারের শার্ট এবং এক জোড়া কালো শু পরেছে ভাতিজা। হাতে ক্যাসিও ঘড়িটসহ তাকে পরীক্ষার হলে ঢুকিয়ে দিলাম। সঙ্গে এক ব্যাগ আশীর্বাদ দিলাম যাতে পরীক্ষা ভালো হয়।

কেন্দ্রের আশপাশে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে বাড়িতে ফিরে এলাম। বলে রাখি, আমাদের বাড়ি থেকে কেন্দ্র দশ মিনিটের পথ। তাই আমরা পায়ে হেটে যাতায়াত করি।

পৌনে একটায় কেন্দ্রের দিকে রওনা হলাম। কেন্দ্রে পৌছানোর কিছুক্ষণ পর পরীক্ষা শেষ হলো।

ভাতিজার জন্য অপেক্ষা করছি।

একটু পর ভাতিজা বের হলো।

পরীক্ষা কেমন হলো? প্রশ্ন করলাম।

হ্যা, ভালো হয়েছে। ভাতিজা উত্তর দিল।

এভাবে এই কথা সেই কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে বাড়িতে ফিরে এলাম। ভাবী শরবত নিয়ে এলেন।

শরবত খেতে খেতে ভাতিজা মাথায় হাত দিয়ে বললো, হায় আংকল, আমি তো তোর ঘড়ি টেবিলে রেখে এসেছি! এই বলে সে দ্রুত ছুটলো কেন্দ্রের দিকে।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো খালি হাতে।

বুঝতে পারলাম ঘড়ি খুজে পায়নি।

আংকল ঘড়ি খুজে পাইনি।

টিচারদের কাছে জিজ্ঞাসা করিসনি? আমি প্রশ্ন করলাম।

টিচাররা সবাই চলে গেছে, অফিস বন্ধ।

অসুবিধা নেই। পরদিন খুজে দেখিস।

কিন্তু পরদিনও পাওয়া যায়নি।

এভাবে পরীক্ষাও প্রায় শেষ পর্যায়ে। শেষ পরীক্ষার দিন ভাতিজা খবর আনলো, ওই স্কুলের একজন শিক্ষক (যে স্কুলে পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল সেই স্কুলের) একটি ঘড়ি পেয়েছেন।

পরদিন ওই টিচারের কাছে গেলাম।

টিচারের নাম ফয়েজ। ফয়েজস্যার জানালেন, তিনি একটা ঘড়ি পেয়েছেন এবং ঘড়িটি কমলকৃষ্ণ বালিকা হাই স্কুলের প্রধান টিচারের কাছে জমা দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ওই পরীক্ষার কেন্দ্রে যেসব স্কুল অংশগ্রহণ করেছে তার মধ্যে কমলকৃষ্ণ গার্লস হাই স্কুলও একটি।

পরদিন ছিল শুক্রবার। তাই শনিবারে গেলাম। কমলকৃষ্ণ গার্লস হাই স্কুলের গেটের কাছে পৌছাতেই চাচা-ভাতিজা দুজনেই অবাক! ঝাকে ঝাকে মেয়ে এদিকে-সেদিকে হাটাহাটি করছে। এখনো ক্লাস শুরু হয়নি।

আগে তুই ভেতরে যা, পেছনে আমি আসছি। ভাতিজা বললো।

না, তুই যা, আমি পেছনে আসছি। বললাম।

না, তুই-ই যা। ভাতিজা আবারও বললো।

আসলে আমরা দুজনেই বয়েজ স্কুলের ছাত্র ছিলাম। তাই কেউ-ই আগে যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। অবশেষে আমি পা বাড়ালাম। তাছাড়া আমি তো চাচা। আমাকেই আগে যেতে হবে।

ভেতরে গিয়ে দেখলাম, সব মেয়েরা কেমন যেন বাকা দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। তারা হয়তো ভাবছে, গার্লস স্কুলে বয়েজের প্রবেশ কেন?

দুর দুর বুকে একটা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, প্রধানটিচারের অফিসটা যেন কোন দিকে?

মেয়েটি কি বুঝলো কে জানে! চোখ দুটিকে হাসের ডিমের মতো করে তাকিয়ে আছে। প্রশ্নটা করে যেন মহা অপরাধ করে ফেলেছি।

তার নীরবতা দেখে প্রশ্নটা আবারও করলাম।

মাথাটাকে নিচু করে, পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে, রবীন্দ্রনাথের *ছুটি* গল্পের নায়ক ফটিকের মতো বললো, ওই দিকে।

তার কথার আগা-মাথা কিছুই বুঝলাম না। কোন দিকে বললো, পূর্বে, না পশ্চিমে, উত্তরে, না দক্ষিণে।

একজন ম্যাডামের ডাকে আমার ভাবনায় ছেদ পড়লো।

কাকে খুজছেন?

জি, আমরা হেডটিচারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

উপরের তলায় দক্ষিণের রুমটা।

ধীরে পায়ে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। এক কদম, দুই কদম করে হেডটিচারের অফিসের সামনে পৌছালাম।

আসতে পারি? ভদ্রতার সুরে অনুমতি চাইলাম।

হেডটিচার পত্রিকার পাতা থেকে মাথা তুলে অচেনা দৃষ্টিতে তাকালেন। সম্মতি সূচক মাথা নেড়ে প্রশ্ন করলেন, কি জন্য এসেছো?

ভাতিজা বলতে আরম্ভ করলো। স্যার, এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিন আমি একটা ঘড়ি হারিয়েছি। কেন্দ্রে যোগাযোগ করে জানতে পারলাম, আপনি একটা ঘড়ি পেয়েছেন। তাই...।

ভাতিজা কথা শেষ করার আগেই হেডটিচার বললেন, হ্যা। আমি একটা ঘড়ি পেয়েছি। তোমার ঘড়িটার নাম কি?

ক্যাসিও।

ঘড়ির রঙটা কেমন?

কালো।

হেডটিচার আরো দুই একটা প্রশ্ন করলেন।

ভাতিজাও সাবলীল উত্তর দিল।

না, আমি যে ঘড়িটা পেয়েছি, সে ঘড়ির সঙ্গে তোমার বর্ণনা মিলছে না।

হেডটিচার একটু থামলেন, মনে হয় আরো কিছু বলবেন। তাই আমি এবং রাফি উৎসুক দৃষ্টিতে ওনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

হেডটিচার আবার বলতে শুরু করলেন।

আসলে আমি যে ঘড়িটা পেয়েছি সেটা একটি লেডিস ঘড়ি। কথা শেষ করেই তিনি পত্রিকায় মনোনিবেশ করলেন।

আমরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হা করে রইলাম। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

ভাতিজা সমানের দিকে পা বাড়ালো।

স্যার, আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। এই বলে আমিও পা বাড়ালাম।

না, না, বিরক্ত কিসের। হেডটিচার বললেন।

ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম থেকে

দেশছুট

- নূর আয়েশা সিদ্দিকা

দেশের সব কিছু পেছনে ফেলে এই দূর প্রবাসে সংসার পেতেছি আজ প্রায় ছয় বছর। ভীষণ হোম সিক আমি। প্রতিটি মুহূর্তে স্মৃতির নস্টালজিয়ায় ভুগি। ফেলে আসা স্বদেশ আর প্রিয়জনদের কথা ভেবেই কেটে যায় বেশির ভাগ সময়। স্মৃতির এই রোমন্থন তীব্রতর হয় ঈদের দিনটিতে।

দেশে থাকতে ঈদের দিনটিতে পরিবারের সবার ঘুম ভাঙতো কাকডাকা ভোরে। বড়রা ঈদগাহে যাবার আগে সবাই এক সঙ্গে বসে মায়ের হাতের রান্না করা সেমাই খেতাম। দুপুরের খাওয়াটাও হতো মা-বাবা আর ছয় ভাই বোন এক সঙ্গে বসেই। সেই আমি আজ প্রিয়জনদের ছেড়ে কতো দূরে!

এখানে প্রায় সবারই ঈদের দিনটি কাটে ঘুমিয়ে। আমাদের দেশের মতো বর্ণালী পোশাক পরে শিশুদের কোলাহল আর ছুটোছুটি এখানে নেই। মনে হয় যেন ঈদের মতো এমন একটি দিনের সকল আনন্দই বুঝি এদের চাপা পড়ে গেছে খনি থেকে তোলা প্রাচুর্যের প্লাবনে। এখানে ঈদের আনন্দের আলাদা কোনো প্রকাশ ভঙ্গি খুজে পাইনি। মাঝে মধ্যে মনে হয় উত্তপ্ত মরুর বালুকারাশি কিংবা সাইমুম ঝড়ের প্রচণ্ডতার মাঝে বুঝি বা জীবিকার তাগিদে দেশছুট এই আমাদের সব আবেগ ও অনুভূতি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে বসেছে। এখানে বেড়ে ওঠা আমাদের আগামী প্রজন্ম হয়তো কখনো অনুভবও করতে পারবে না আমাদের ছেলেবেলার ঈদের প্রাণময়তাকে।

বছর খানেক আগে আমার ইমিডিয়েট বড় ভাইটিও উচ্চ শিক্ষার জন্য পাড়ি জমিয়েছেন লন্ডনে।

গত বছর ঈদের ভোরেই ফোন করলাম ভাইয়াকে। কান্নার ধাক্কায় বেচারা দেখি ফোনে কথাই বলতে পারছেন না।

সারা দিনই তার কথা ভেবে মনটা কাটলো প্রচণ্ড অস্থিরতার মধ্যে। সন্ধ্যায় দেখি তিনিই ফোন করেছেন।

এখন অবশ্য তার গলাটা ফ্রেশ মনে হলো। জানালেন, বাংলাদেশে ফোন করে সবার সঙ্গে কথা বলেছেন।

আমাকে বললেন, জানিস, আম্মু বলেছেন, আমাদের ঈদের গরুটা নাকি ঈদের আগের দিন সিটি কর্পরেশনের ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। ভাগ্যিস আমরা দুজন দেশের বাইরে! না হলে ওই ময়লা গরুর গোশত আমাদেরও খেতে হতো।

প্রচণ্ড কষ্টের মাঝেও ভাইয়ার মুখ থেকে এই ঘটনা শুনে ফোনে গলা ছেড়ে হাসলাম যেন খুব বাচা বেছে গেছি এমন ভঙ্গিতে আমিও তার কথায় সায় দিই। ব্যাপারটা যদিও *খেতে না পারলে আঙুর ফল টক*-এর মতোই।

রাতে ঘুমোতে গিয়ে ভাবলাম এমন সময় কি কখনো আমাদের জীবনে আসবে যেদিন কোনো মানুষকে আর জীবিকার জন্য প্রিয়জনদের ছেড়ে বিদেশ-বিভূইয়ে পা বাড়াতে হবে না - কিংবা পলিটিশিয়ানদের স্বার্থের দ্বন্দ্বে দেশের মেধাবী সন্তানদের মায়ের কোল ছেড়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য দূর প্রবাসে ছুটতে হবে না!

এভাবে মনের চার দেয়ালের মাঝে উত্তরহীন প্রশ্নের মধ্যে দিয়েই শেষ হয় আমার প্রবাসী জীবনের আরো একটি নিরানন্দ ঈদের দিনের।

সউদি আরব থেকে

আপনার মায়াবতী

আমার প্রিয় বন্ধুজি

আপনাকে দেখি না কতো দিন। এই না দেখার মাঝে পেরিয়ে গেল চারটি বছর। আজ কেন চিঠি লিখতে ইচ্ছা হলো নিজেই জানি না। আপনাকে কয়েকদিন মনে করেছি এর হিসাব নিশ্চয় চাইবেন না। হিসাবটা আমিই জানি না। কি দরকার ছিল বলেন তো, আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার! সবই তো ঠিক চলছিল। হঠাৎ ভালোবেসে ফেললাম।

আজও মনে আছে দিনটি। নিজেকে ঠেকানোর কি চেষ্টা আমার, কতো যুদ্ধ! কিন্তু আমাকে ধাক্কা দিয়ে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়লো একরাশ ভালোবাসা। আমাকে এক মুহূর্তেই আলো করে দিল। বিশ্বাস করেন, এ প্রেম আমার বুকে লুকিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম। প্রাণ চলে গেলেও কোনোদিন আপনাকে বলতাম না। নিজেই ভরে উঠলাম খুশিতে।

আপনি ভালোবাসলেন। আমার সামনে বসে থাকা মিষ্টি হাসির এই মানুষটাকে না করতে পারলাম না। আপনি যতোবার আমার দিকে তাকিয়েছেন, মিষ্টি করে তাকিয়েছেন - যতোবার কথা বলেছেন, আদর মাখা কণ্ঠে বলেছেন।

আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে খুব সাধারণ জীবন ছিল আমার। কোনো চাওয়া নেই, তেমন পাওয়াও নেই। বড়জোর সে জীবনে ছিল হাতের মুঠোর কয়টা ঝরা শিউলি, ভোরের কুয়াশা গালে এসে মাখামাখি করতো। কখনো জ্যোৎস্না ছোয়ার সাহস দেখাইনি, ভাবিনি রঙিন হবে জীবন। আপনি প্রথম জ্যোৎস্না ছুতে শেখালেন। রঙিন রঙধনুটা আমার হাতের মুঠোয় এনে দিলেন। আমার জীবনের সবচেয়ে রঙিন উপহার আপনার রঙধনুটা।

আজ মনে হয় একটা রঙধনু উপহার দিয়ে বুঝি বদলে আমার সব রঙ নিয়ে গেলেন। রঙধনুটা আজও আমার চোখে আছে। তাই বুঝি চোখে আমার অনেক বৃষ্টি।

আজ জ্যোৎস্না ছুতে শিখেছি। জ্যোৎস্না ছোয়ার সময় মনে হয়, এ আলোটুকু যদি আপনার গায়ে ঠিকরে পড়তো! কারণ আপনার এবং আমার আকাশ একটাই। চাদও একটাই। যেদিন থেকে আপনাকে আর দেখি না সেদিন থেকে আমার জীবনটা খুব ওলোট–পালোট হয়েছে তা বলবো না। তবে ভেতরটা হয়েছে। অনেক ভিড়ের মাঝে ভয় হয়। পথে ছায়া বাচিয়ে চলি। বার বার প্রার্থনা করি অন্য কেউ যেন হৃদয়ে স্থান না পায়।

আপনার হৃদয়ের সবচেয়ে বড় অংশটা আমায় রাখতে দিয়েছেন। আছে। যত্নও করি। কারো মাঝে আপনার কণ্ঠস্বর খুজে পাই আবার কারো মাঝে চেহারা। তখন তার ওপর রাগ হয়। আপনার মতো হবে কেন? আপনি আমাকে মনে করেন এটা ভাবা আমার দুঃসাহস। আমি কখনো আপনাকে দেখতে চাই না। আপনার জীবনে আপনি সুখী হন। মিষ্টি মিষ্টি করে হাসুন। শুধু তাই চাই।

আপনি কি আমাকে ভুল বুঝেছিলেন? বিশ্বাস করুন, আমার কোনো চাওয়া ছিল না। কখনোই বলতাম না আকাশটা নামিয়ে আনুন। আমার নীল শাড়ি পরতে ইচ্ছা হচ্ছে। বলতাম না সমুদ্রের নীল আজলা ভরে নিয়ে আসুন চোখে কাজল পরবো। বলতাম না এনে দিন এক মুঠো রোদ, সঙ্গে কয়টা তারা, গলায় পরবো।

হ্যা, হয়তো বলতাম ভীষণ বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছা হচ্ছে। হাতটা একটু ধরুন, চলুন ভিজি। আপনিই বলুন, এটুকুই চাওয়া আমার দোষের হতো? এটা কি খুব বেশি চাওয়া বা ভুল চাওয়া? কতোবার ভেবেছি আপনাকে ভুলে যাবো। আর না।

কোনোবার আমার মনই আমাকে সায় দেয়নি। যাকে ভালোবাসি তাকে কেমন করে ভুলতে হয় জানি না। আপনি কি জানেন? আমাকে কি একটু শিখিয়ে দেবেন? শিখতে পারবো, সত্যিই পারবো। আপনি আমার খুব প্রিয় অংশ, খুব মিষ্টি অংশ। এ ভালো লাগার অংশটা শুধুই একা আমার।

আপনি খেয়াল করতেন কি না জানি না। যখন আপনি কথা বলতেন, আনন্দে ঝলমল করে উঠতাম। যেভাবে আপনার পথের দিকে চেয়ে থাকতাম। দেরি হলে ছটফট করতাম। এভাবে কেউ কোনোদিন আপনার পথ দেখেনি। এসব কোনোদিন আপনাকে জানতে দেবো না।

কোনোদিন কোনো প্রশ্ন করিনি। আজ একটাই প্রশ্ন করবো, চোখ বন্ধ করে অন্ধের মতো জলে নেমে গিয়েছিলাম বলে কি আপনার মনে হয়েছে আমাকে পাওয়া জলের মতো সহজ?

এসব কথা আসলে আজ অবান্তর। আজ খুব ইচ্ছা হয়, পাখির বাসার মতো ছোট্ট বাসা হবে। শুধু আপনি আর আমি।

আপনি কয়েক হাজার কথা বলছেন হাসিতে ভেসে, আমি আপনার হাসি মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছি। কথার ফাকে অবচেতন মনে আপনি আমার চুল, গাল ছুয়ে দিচ্ছেন। আনন্দে কাঠ হয়ে চুপটি মেরে বসে আছি। নড়লেই যদি আপনার ভালো লাগার তারটা ছিড়ে যায়!

সেদিন আপনি হাসবেন আর আমি জলে ভাসবো। কখন আমার গালে চোখের জলের দাগ বসে যাবে। দোয়া করবেন আমার জন্য যাতে আমার চোখে মায়া টল টল করে। জানি কোনোদিন হয়তো আর দেখা হবে না। আমার মনে আপনি রাজপুত্র হয়ে থাকবেন –

যে আমাকে মায়া করতো।
যে আমাকে আগলে রাখতো।

শুধু আপনার মায়াবতী
ভাটিয়ারী, চট্টগ্রাম থেকে

আশ্রয়

- এম.এ সামাদ

হাসনা ভাবী খুবই জলি টাইপের মানুষ। যখনই তার বাসায় যেতাম, সুমধুর হাসিতে বরণ করে নিতেন এবং চা-নাশতা খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। গল্প-গুজবে সময়টা কাটতো বেশ।

অনেক সময় তার স্বামী মীর সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও আমাকে তিনি ছাড়াতে চাইতেন না। তখন তিনিও বলতেন, আরে ভাই থাকেন না আরো কিছুক্ষণ, তাকে সঙ্গ দেন, আমি তো বাইরে যাচ্ছি। ওতো ঘরে একা।

আমি তখনো অবিবাহিতা। কিন্তু তাদের উভয়েরই আমার ওপর আস্থা ছিল অপরিসীম।

এদিকে নাসরিনের সঙ্গে আমার যে গত দেড় বছর যাবৎ প্রেম-ভালোবাসা চলছি তা ভাবীকে জানাইনি।তবে তাকে জানাতে বাধ্য হলাম যখন তাদেরই কাছাকাছি আমার নামে সরকারি বাসা বরাদ্দ হলো। এতোদিন তো নাসরিনদের পাশাপাশি থাকতাম ফলে আমাদের লেন-দেনে কোনো সমস্যা হতো না।

হাসিমুখেই ভাবী বললেন, *কুছ পরোয়া নেই*। আমি সব ব্যবস্থা করবো। আপনার নতুন বাসায় যেহেতু বৃদ্ধা মা ও ছোট ভাই-বোন থাকবে, তাই আপনারা দুজন আমার বাসায়ই এসে সময় কাটাবেন।

আশ্বস্ত হয়ে ভাবীকে ধন্যবাদ জানালাম।

তারপর থেকে আমাদের আশ্রয়স্থল হলো হাসনা ভাবীর বাসা। নির্দিষ্ট দিনে অফিসে *ক্রেঞ্চ লিভ* নিয়ে ছুটে আসতাম।

সেও স্কুলের নাম করে চলে আসতো। তখন সে ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্রী।

মীর সাহেব অফিসে চলে যেতেন। ভাবী দুটি অবুঝ শিশুকে নিয়ে ঘরে একা। এ নিরিবিলি পরিবেশে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ করতাম।

কোনো কোনো সময় ভাবীও এসে যোগ দিতেন। বলতেন, বিয়েটা কখন হচ্ছে?

লজ্জায় লাল হয়ে যেতো নাসরিনের মুখ। এভাবে প্রায় বছর খানেক কাটলো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের ভালোবাসা টিকলো না। সে আরেক কাহিনী। অভিভাবকের চাপে আমি অন্যত্র বিয়ে করে সংসারী হলাম।

ইতিমধ্যে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল। যে যেদিকে পারে ছিটকে পড়লো। হাসনাভাবী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গ্রামের বাড়ি চলে গেলেন। তার স্বামী আগস্ট ১৯৭১-এ এসে পাক সরকারের চাকরিতে যোগ দিলেন।

দেশ স্বাধীন হবার অনেক পর।

ভাবী তখনো গ্রামের বাড়িতে। এদিকে মীর সাহেব পাশের বাসার মুক্তিযুদ্ধে স্বামী হারা এক মেয়ের সঙ্গে প্রেম করে তাকে বিয়ে করার জন্য উন্মাদ হয়ে গেলেন।

একদিন ওই মেয়ের বৃদ্ধা পিতা আমাকে বাসায় নিয়ে গেলেন এবং মীর সাহেবের লেখা এক দীর্ঘ চিঠি আমার হাতে দিয়ে বললেন, আপনার বন্ধুর কাণ্ড দেখেন।

চিঠি পড়ে থ হয়ে গেলাম। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেক কিছু লেখার পর পিতার কাছে মেয়ের পাণি প্রার্থনা তিনি করেছেন।

তাকে বললাম, এটা তার সাময়িক মোহ। একটা সুখের সংসার এভাবে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে না।

মীর সাহেবের তখন চার পাচটা সন্তান হয়ে গিয়েছে।

পরদিনই হাসনাভাবীকে চিঠি লিখলাম, তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলে আসুন। না হলে কপাল ভাঙবে। পত্রপাঠ মাত্রই ভাবী বাসায় চলে এলেন এবং বিস্তারিত জানার পর তুলকালামকাণ্ড ঘটিয়ে ফেললেন। উপস্থিত সকলের সহানুভূতিই ভাবীর পক্ষে গেল। মীর সাহেবের প্রেম উবে গেল, ভণ্ডুল হয়ে গেল বিয়ের খায়েশ। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো সংসার।

ভাবী আমাকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বললেন, সময় মতো খবর না পেলে সর্বনাশ হয়ে যেতো।

তাকে বললাম, ভাবী, জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলোতে আপনি আমাকে ও নাসরিনকে দিয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়। সেই আমি কি আপনার স্থায়ী আশ্রয়টাকে নষ্ট হতে দিতে পারি?

মীর সাহেব এখন লোকান্তরে। প্রায় ডজন খানেক সন্তানকে নিয়ে ভাবী সংসারটাকে আগলে রেখেছেন। চট্টগ্রামে নিজস্ব একটা ঠিকানা করে নিয়েছেন। মোটামুটি ভালোই কাটছে দিন।

পাহাড়তলি, চট্টগ্রাম থেকে

মাতৃভূমি

- রিয়াজ

গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল সাবওয়ে স্টেশনে দাড়িয়ে রফিক ডাউনটাউন ম্যানহাটান যাবার ট্রেনের অপেক্ষা করছিলেন। সাবওয়ে স্টেশনটিতে নানান ধরনের খুচরা দোকানে ক্রেতাদের ভিড় লেগে আছে। এর মধ্যেও দুই একজন দোকানি আছে একাকী দোকানে বসে। কোণার দিকে এমনি একজন দোকান সাজিয়ে বসে আছে।

দোকানির দিকে এক পলক তাকিয়ে রফিক চোখ ফিরিয়ে নিলেন। চেহারাটা খুব চেনা লাগছে। এশিয়ান ফেস, বাড়ি সম্ভবত শ্রীলংকায় হবে।

শ্রীলংকানরা দেখতে অনেকটা বাংলাদেশিদের মতো ভালোভাবে দেখার জন্য আরো কিছুক্ষণ তাকানোর দরকার ছিল। কিন্তু তাকিয়ে থাকলে আবার সে নিজের দোকান থেকে কিছু গছিয়ে দেয়ার জন্য চেষ্টা করতে পারে। সে চেষ্টা করলে সফল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেননা কোনো জিনিস নিয়ে কেউ বেশি সাধাসাধি করলে রফিক সেটা কিনে ফেলেন।

তার স্ত্রী নাজমা এটা নিয়ে অনেক দিন রাগারাগি করেছেন। তাই রফিক কোনো অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আজ বাড়ি ফিরতে চান না। এ জন্য তিনি দোকানিকে কোনো সুযোগ দিতে চান না।

কিন্তু দেখা গেল দোকানিই এসে হাজির হয়েছে তার কাছে।

আসসালামু আলাইকুম, আপনি কি বাংলাদেশি? ইংরেজিতে প্রশ্ন করলো লোকটা।

রফিক স্থির দৃষ্টিতে লোকটার দিকে তাকালেন। ভাবলেন কি চায় লোকটা?

এভাবে তাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটা বললো, দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। আপনাকে দেখে আমার দেশের লোক মনে করেছিলাম।

তোমার বাড়ি কোথায়? কতো দিন হলো এ দেশে এসেছো? বাংলায় প্রশ্নগুলো করলেন রফিক।

আমার বাড়ি নওগা। এখানে অল্প দিন হলো এসেছি। লোকটা এক গাল হাসি দিয়ে বললো। তারপর এক গাদা কথা বলতে লাগলো যার মধ্যে অনেক কথাই প্রয়োজনহীন।

দেশি একজন লোক পেয়ে মনে জমে থাকা কথা বলছে লোকটা। তাই তিনি বাধা না দিয়ে চুপচাপ শুনে যেতে লাগলেন। এক সময় তিনি ট্রেনে ওঠার জন্য ছেলেটার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। যাবার সময় ছেলেটি জোর করে তাকে একটা গিফট বক্স ধরিয়ে দিল। তিনি অনেক চেষ্টা করেও ছেলেটিকে কোনো টাকা দিতে পারলেন না।

ট্রেনে বসে গিফট বক্সের মোড়ক খুলে ফেললেন তিনি। একটা মোমের তৈরি বাংলাদেশের মানচিত্র। কাচা হাতের তৈরি। তাই সব স্থান নিখুত হয়নি। সম্ভবত ছেলেটির নিজের হাতে বানানো।

মোমের তৈরি মানচিত্রটিকে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন তিনি। দেশ ছেড়ে চলে এসেছেন অনেক দিন আগে। আমেরিকায় এসে অনেক কষ্ট করেছেন তিনি। কতোদিন পালিয়ে থেকেছেন, কতোদিন না খেয়ে থেকেছেন। হয়েছেন অপমানিত, লাঞ্ছিত। তারপরও আমেরিকা ছাড়েননি তিনি। ধীরে ধীরে পরিশ্রম করে নিজের একটা জায়গা বানিয়েছেন তিনি। এখন তার গাড়ি এবং ব্যাংকে ডলার সবই আছে।

দেশ থেকে চলে আসার প্রথম দিকে যোগ ছিল চিঠিপত্রের মাধ্যমে। পালিয়ে থাকা ও নানান রকম ঝঞ্ঝাটের কারণে তাও ধীরে ধীরে কমে যায়। এ রকম এক সময়ে মায়ের অসুস্থ হওয়ার সংবাদ পেয়েও দেশে ফেরা হয়নি। ফিরে গেলে যে আর এ দেশে আসা হবে না! তখন সেই পোড়া দেশে বসে কিইবা করতেন? তাই যাওয়া হয়নি।

এক সময় মায়ের মৃত্যু সংবাদ এসে পৌছেছিল তার কাছে।

বড়ভাবী বলেছিলেন, মৃত্যুর আগে মা নাকি বার বার দরজার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন আর জিজ্ঞাসা করছিলেন, টুকু আসেনি?

হয়তো মা চাইছিলেন তার ইচ্ছা শক্তির কারণেই যেন টুকু আমেরিকা থেকে এসে ওই দরজা দিয়ে ঢুকবে। বোকা মা, বোঝেন না ছেলে তখন আমেরিকায় কি অবস্থায় আছে। কঠিন বাস্তবের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করেছেন। নিজের প্রাণপ্রিয় মাকে দেখতে তিনি দেশে যেতে পারেননি।

মা মারা যাবার পর আর দেশে যাবার কোনো কারণ খুজে পাননি তিনি। দেশের কথা খুব একটা ভাবেন না। তিনি এখন আমেরিকার নাগরিক। শপথ বাক্য উচ্চারণ করে তিনি আমেরিকাকে রক্ষার সংকল্প করেছেন। তাই তার চিন্তা ভাবনাও আমেরিকা কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে। এখানে তিনি সুখে আছেন। দেশের যে অবস্থা সংবাদপত্রে পড়েন তাতে মনে হয় ওইখানে না গিয়েই তিনি ঠিক করেছেন।

দেশের প্রতি ভালোবাসা আর পাকিস্তানিদের প্রতি তীব্র ঘৃণা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে সব কেমন হয়ে গেল। এক সময় তিনিও হতাশ হয়ে চলে এলেন দেশ ছেড়ে। আজ অনেক দিন পর একটা মোমের মানচিত্র তাকে দেশের কথা মনে করিয়ে দিল।

বাড়ি ফিরে অন্যদিনের মতো সব কাজ করলেন। স্ত্রী এবং বাচ্চাদের সঙ্গে গল্প করলেন। সবাই এক সঙ্গে বসে রাতের আহার সারলেন। এমনকি তার সেক্রেটারি মিস ফ্রেনি যে আজকে দুই পায়ে দুই রকম জুতা পরে এসেছিলেন তাও গল্প করলেন। আহার সেরে কিছুক্ষণ টিভি দেখে বুশকে গালি দিয়ে ঘুমাতে গেলেন।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন রফিক। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে নদীতে গোসল করতে নেমেছেন। বার বার দুষ্টুমি করে তীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তার বাবা বার বার নিষেধ করলেও শুনছেন না। হঠাৎ বেশি দূরে চলে যাওয়াতে স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগলেন। ভয় পেয়ে প্রচণ্ড জোরে চিৎকার করে মাকে ডাকতে লাগলেন। এখনো প্রচণ্ড জোরে মা বলে চিৎকার করে উঠলেন। তার ঘুম ভেঙে গেল, সেই সঙ্গে বাড়ির অন্য সবার।

ছোটবেলায় ঘটা ঘটনাটা স্বপ্নে দেখে আজ তার মনে তীব্র বোধের সৃষ্টি হলো। তার গ্রামের সেই পায়ে চলার পথ, রহস্যময় গভীর দীঘি, মন কেমন করা পাখির ডাক, মাঝে মধ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে চুপচাপ বসে থাকার সেই পোড়াবাড়ি, সব কিছুর জন্য তার মন কেমন করতে লাগলো। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্কুল কলেজ, খেলার মাঠ সব কিছুর জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠলো।

ছোটবেলায় গা ছমছমে বটতলা, ভূতের গল্প শোনানো নানিবুড়ি, পূর্ণিমার রাতে গাছের ফাক দিয়ে আসা চাদের আলোর জন্য তিনি তীব্র টান অনুভব করলেন।

এতো দিন পর রফিক বুঝতে পারলেন তার শিকড় কোথায়। একটা ক্ষুদ্র, তুচ্ছ স্বপ্ন তার মনের সেই দরজাটা খুলে দিল যা তিনি অনেক আগেই বন্ধ করে দিয়েছিলেন। হায়রে স্বপ্নের আমেরিকা, তুমি স্বপ্ন না, স্বপ্ন হত্যাকারী? নাহ! আর দেরি নয়। রফিক ভাবেন, যে মাটিতে ঠাই পেয়েছেন তার বাবা–মা, ভাই–বোন ও আত্মীয়–স্বজন সেই মাটিতেই তাকে ফিরতে হবে। কিন্তু সেই মাটি কি তাকে ক্ষমা করবে? তিনি যে তাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে এসেছেন। তাকে ভুলে আছেন এতো বছর এবং তার মুখও দর্শন করতে চাননি কখনো আর। এতো কিছুর পরও কি তাকে ক্ষমা করবে তার দেশের মাটি! মাতৃস্নেহে কি আশ্রয় দেবে নিজের বুকে?

ছোটবেলায় শেখা একটি গান মনে পড়লো রফিকের। *ধন, ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা।*

তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা তার পাশে বসে উদ্বিগ্ন চোখে তাকে নানান প্রশ্ন করতে লাগলো।

তিনি তাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সুর ঠিক করে গানটি গাইতে লাগলেন। *তাহার মাঝে আছে যে এক সকল দেশের সেরা ও সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, এমন দেশটি কোথাও খুজে পাবে নাকো তুমি, সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।*

রফিকের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি বের হতে লাগলো।

খালিশপুর, খুলনা থেকে

সিমলা মানালি দিল্লি

- ছালেহা খানম জুবিলী

অধ্যাপক স্বামী, একমাত্র পুত্র সন্তান আর আমি, এ নিয়েই আমাদের ছোট্ট সংসার। বছরে একবার আমরা দেশের বাইরে সম্ভব না হলে দেশের মধ্যে কক্সবাজার, সুন্দরবান কিংবা রাঙামাটি, কোথাও না কোথাও ঘুরে আসি। আমার স্বামীর মতে, সারা বছর বই আর ক্লাস নিয়ে নিয়ে মনটা যখন হাপিয়ে উঠে তখন একটু চেঞ্জ দরকার।

ঠিক হলো ১৭ মে ২০০৪–এ আমরা প্রথমে সিমলা যাবো। ওখানে কয়েকদিন থেকে মানালি ঘুরে দিল্লি হয়ে ঢাকা ফিরবো।

আনন্দে অপেক্ষার প্রহরগুলো শেষ হলো। আমরা সিমলা রওনা হয়ে গেলাম। সিমলা যেতে পথে প্রথম ব্রেক দিলাম চন্ডিগড় *পিঞ্জর গার্ডেন।* পিঞ্জর গার্ডেন দেখে আবার সিমলার উদ্দেশ্যে রওনা। সুন্দর জায়গা। আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে, মন ভরে গেছে। পথ যতো এগোচ্ছে ততোই ঠাণ্ডা অনুভূত হচ্ছে।

হাজার হাজার পাহাড়ের কোল ঘেষে রাস্তা। পাথরের পাহাড়। গাড়ি পড়ে গেলে হাড় মাংস খুজে পাওয়া যাবে না। পাহাড় আর পাহাড়। এবং পাহাড়ের গা ঘেষে রাস্তার কোথাও কোনো রেলিং দেয়া নেই। গাড়িগুলো খুবই স্মুথলি চলছে। পাহাড়ের বাক ঘুরছে একটার পর একটা। কিন্তু কোনো পাল্লাপাল্লি নেই। একটা জিনিস খেয়াল করলাম, এই দুর্গম পাহাড়ি পথে গাড়ি চলছে, কোনো রকম অযথা প্যাপো হর্ন বাজানো হচ্ছে না।

পাহাড়ের বাকগুলো ঘোরার সময়টা খুবই বিপজ্জনক। পরে অবশ্য ড্রাইভারের কাছে জেনেছি রাস্তার মাঝখানে যে শাদা দাগ দেয়া আছে তা একচুল পরিমাণও কেউ অতিক্রম করে না। সবাই দাগের ভেতরে থেকে গাড়ি চালায়। তাই বিপরীতমুখী গাড়ির সঙ্গে সংঘর্ষের কোনো ভয় নেই।

বিকাল তিনটায় পৌছে গেলাম সিমলায়। হোটেল *সানরাইজ*–এ উঠলাম। উল্লেখ্য, সিমলা নগরীতে স্কুল–কলেজ, বাজার, খেলার মাঠ, শপিং মল, মন্দির সবই সুউচ্চ বিশাল পাহাড়ের ওপরে। এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। রাতে গায়ে কম্বল চড়ালাম।

বাচ্চা ঘুমে থাকতেই আমরা ভোর পাচটায় ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় বসে দূরের ঘন কুয়াশা ঘেরা পাহাড় দেখে নিলাম। স্বামীর বুকের উষ্ণতায় তার বাহুবন্ধনে থেকে বাইরের কুয়াশায় গা ভেজালাম।

পরের দিন সকাল দশটার দিকে মানালির উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলাম। সেই একই রকম পাহাড়ি দুর্গম পথ। পথের এক পাশে বিশাল পাহাড়, অন্যপাশে গভীর খাদ। কোথাও সারি সারি আপেল গাছ, কোথাও জুম চাষীদের বাগান। দুই নয়ন ভরে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে পৌছে গেলাম।

মানালি। তখন রাত নয়টা। উঠলাম হোটেল *কেনিলওয়ার্থ ইন্টারন্যাশনাল*-এ।

আমাদের জন্য আগে থেকেই ফ্যামিলি রুম বুকিং দেয়া ছিল। এখানে সিমলা থেকেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এপৃল, মে-তে ইনডিয়ার এক প্রান্তে অর্থাৎ আগ্রা, দিল্লিতে তাপমাত্রা যখন চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে। গরমে জীবন যখন ওষ্ঠাগত তখনই সিমলা, মানালিতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। রাতে পাহাড়ের চূড়ায় বরফের বিশাল আস্তরণ পড়ে। সারা দিন গলে গলেও শেষ হয় না। পাথরের পাহাড়গুলোকে মনে হয় বরফের পাহাড়।

রাতের খাবার সেরে সোজা বিছানায়। উল্লেখ্য, মানালির কেনিলওয়ার্থ হোটেলটি সুরম্য, সুবিশাল, ঝকঝকে তকতকে।

সকালে হোটেল বয়ের ডাকে ঘুম ভাঙলো। দ্রুত নাশতা সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। পাহাড়ের সঙ্গে তুলা বরফের সখ্যতা। ঝরনার সঙ্গে সূর্যালোকিত আকাশের মাখামাখি। আমরা মানালি আইসিসি পয়েন্ট দেখার জন্য রওনা হয়ে গেলাম রোথাংপাস আইস পয়েন্টে।

পাথরের পাহাড়ি দুর্গম পথ, পাহাড়ের বাক ভেঙে ভেঙে গাড়ি দ্রুত চলে যাচ্ছে উপরে। ভয়ে গায়ের পশম শুদ্ধ দাড়িয়ে যায়। নিচের দিকে তাকালে দম বন্ধ হয়ে আসে। গাড়ি যতো এগোচ্ছে, ঠাণ্ডা ততোই বেড়ে যাচ্ছে।

আমাদের সঙ্গে (গাইড) খন্দকারভাই বললেন, পথেই ভাড়ায় সব ড্রেস, বুট, জুতা, হাতমোজা, বড় আলখাল্লা, পশমের কোট, পাওয়া যায়।

আমরা পথে গাড়ি থামিয়ে ড্রেস পরে নিলাম।

সকাল আটটায় রওনা হয়ে বেলা বারোটায় রোথাংপাস আইস পয়েন্টে পৌছে গেলাম। আমাদের মতো বহু দর্শনার্থীর গাড়ি উপরে উঠছে। কিন্তু আগে যাবার তাড়া নেই। হাই ভলিউমে গান কোনো গাড়িতে বাজছে না। গাড়ি চালনার ক্ষেত্রে ড্রাইভাররা তাদের প্রচলিত নিয়মের এতোটুকু ব্যতিক্রম করছে না। কোথাও কোথাও লেখা আছে গাড়ি সমতল ভূমি থেকে কতো হাজার হাজার ফিট উপরে।

বরফ আর বরফ। পাহাড়গুলো যেন বরফের শাদা মখমল গায়ে চড়িয়ে সেজেছে। এ এক অদ্ভুত অনুভূতি। বরফের মধ্যে ইচ্ছা মতো ছুটোছুটি করলাম। বরফের চাকা বানিয়ে খেললাম। বরফ কেটে রাজা-রানী বানানো বরফের ঘরে বসে ছবি ওঠালাম।

ঘণ্টা খানেক থেকে হোটেলে রওনা হয়ে এলাম। সেদিন দুপুরের খাবার খেতে খেতে বিকেল হয়ে গেল। পরের দিন মানালির সেরা শপিং সেন্টারগুলো ঘুরে দেখলাম। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দিল্লির উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠলাম। সারা রাত গাড়িতে কাটিয়ে পরের দিন বেলা তিনটায় দিল্লি *হোটেল রাজ*-এ উঠলাম।

দিল্লিতে প্রচণ্ড গরম। রাতে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে ইন্দিরা মিউজিয়াম, কুতুব মিনার, লোটাস টেম্পল, রাজঘাট, ইনডিয়া গেট, হযরত নিজামউদ্দিন আওলিয়ার মাজার শরিফ দেখে হোটেলে ফিরলাম।

পরের দিন দিল্লিতে বড় শপিং সেন্টারগুলো ঘুরলাম। কেনাকাটা করলাম। রাতে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে আকাশে উড়লাম।

আমার ছোট্ট জীবনে এবং আর্থিক সঙ্গতির দিকে খেয়াল রেখে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর বহু জায়গা স্বামী ও সন্তানের সঙ্গে বেড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু ইনডিয়ার মানালির রোথাংপাস আইস পয়েন্টের মতো দুর্গম, অথচ চমৎকার সুন্দর জায়গা আর দেখিনি।

মালিবাগ, ঢাকা থেকে

মিথ্যা ভূতের সত্যি গল্প

- পাপিয়া রহমান

ভূত বলে কিছু নেই এ কথাটি দিয়ে যতোই আমরা গলাবাজি করি না কেন, অন্ধকার রাতে ভূত কথাটি শুনলে সবারই শরীরটা কেমন ছম ছম করে ওঠে। সেই সময়টা যদি হয় ঘন অন্ধকারে ঢাকা জঙ্গলের মাঝে তাহলে তো কথাই নেই। আজ সেই মিথ্যা ভূতের সত্য গল্পটাই বলবো।

সে অনেক দিন আগের কথা। ১৯৬৬ সালের এপৃল মাস। সদ্য এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে ঢাকায় এসেছি। পল্টনে ফুপুর বাসায় উঠেছি। একঘেয়ে পড়া আর পরীক্ষার টেনশন থেকে মুক্তি পেয়ে মনটা শরতের আকাশের মতো আনন্দে নেচে উঠেছে।

আপা ও দুলাভাইয়ের সঙ্গে আজ ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের অডিটোরিয়ামে ওস্তাদ নাজাফত আলী ও ওস্তাদ সালামত আলীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে গেলে কাল যাচ্ছি আব্বাস উদ্দীন আহমদের স্মরণ সভায় পল্লিগীতি ও ভাওয়াইয়া গানের আসরে। ফাকে ফাকে চলছে বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি সিনেমা দেখার পালা। বিখ্যাত সিনেমা *সুইস ফ্যামিলি রবিনসন* এবং *দি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড প্রফেসর* তখনই প্রথম দেখি।

এভাবে বেরিয়ে আর হই চই করে কখন যে ছুটি শেষ হয়ে এলো তা জানতেই পারিনি। রেজাল্ট বের হওয়ার পর বাড়ি ফেরার পালা।

এরই মাঝে হঠাৎ একদিন দুলাভাই কোর্ট থেকে এসে ঘোষণা করলেন, কাল আমরা সবাই মিলে ময়মনসিংহ বেড়াতে যাবো।

পরদিন শুক্রবার, ছুটির দিন।

রাতে আনন্দের আতিশয্যে আমার ঘুমই আসতে চায় না। আমি ও আপার ছোট্ট ছেলে ফাহিম দুজনে মিলে কাল সারা দিন ধরে কি আনন্দ করবো সেই সব ভাবনায় ব্যস্ত। অবশেষে ফুপুর ধমক খেয়ে দুজনেই ঘুমালাম। কিন্তু ঘুমালে কি হবে? স্বপ্নে দেখছি সবাই আমাকে ফেলে রেখে চলে গেছে। চমকে ঘুম থেকে জেগে দেখি মাত্র সকাল।

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে বাইরে এসে দেখলাম গাড়িতে সব জিনিসপত্র তোলা হয়ে গেছে। এখন শুধু দুলাভাইয়ের দুই বন্ধুর জন্য অপেক্ষা। সকাল সাতটার আগেই তারা এসে পৌছালে দুই গাড়ি নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হলো।

ছুটির সকালের নিস্তব্ধ ঢাকাকে পেছনে ফেলে আমরা টঙ্গি অভিমুখে এগিয়ে চললাম। সে সময় টাঙ্গাইল হয়ে মধুপুর গড়ের মধ্য দিয়ে ময়মনসিংহ যেতে হতো। ভালুকা হয়ে যাওয়ার রাস্তা তৈরি হয়নি।

তুরাগ নদীর বৃজ পার হয়ে টঙ্গি শহর ছাড়তেই শাল ও গজারির হালকা বন চোখে পড়লো। মাঝে মধ্যে সমতল এলাকায় ধানক্ষেত ও ছোট ঘরবাড়ি দেখা গেলেও জয়দেবপুরের পরে শুধুই বন আর বন।

একে একে কোনাবাড়ি, মৌচাক ও শফিপুর পার হয়ে চন্দ্রা পৌছালো গাড়ি। স্কাউট জামবোরির সময় মৌচাক বেশ সরগরম হয়ে উঠলেও এখন সব একেবারে নিস্তব্ধ এলাকা। চন্দ্রা তখন ঘন জঙ্গলে ঢাকা একটা পিকনিক স্পট। প্রায়ই ঢাকাই সিনেমার শুটিং এখানে হয়ে থাকে।

এবার টাঙ্গাইলের পথে যাত্রা শুরু হলো। মাঝে মধ্যে গজারির বন। রাস্তা সুরু। ট্রাফিক একেবারেই নেই। সেই ফাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে চোখে পড়লো ময়মনসিংহ ক্যাডেট কলেজ (বর্তমানে মির্জাপুর), ভারতেশ্বরী হোমস ও করটিয়া কলেজ। ঘন জঙ্গলের মাঝে ফাকে অবস্থিত এসব প্রতিষ্ঠানগুলো যেন সত্যিকারের শিক্ষার আবহকে ধরে রেখেছে বলে মনে হলো।

টাঙ্গাইল শহরটি বেশ ছোট। অধিকাংশ ঘরবাড়ি কাঠের তৈরি। সরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিত্তশালীর বাড়িগুলোর পাশে এসব কাঠের বাড়ি দেখতে বেশ মজাই লাগে।

টাঙ্গাইল পার হয়ে ডান দিকে মোড় নিল গাড়ি। প্রাচীনকালের হিন্দু জমিদারদের তৈরি মন্দির, ঘরবাড়ি, পানির জন্য কাটা দীঘি দেখতে দেখতে বেলা দশটা নাগাদ মধুপুরে এসে পৌছালাম। দুই ধারে আনারসের বাগানে এখন সবেমাত্র ফল ধরেছে। মধুপুরের আনারস মিষ্টি স্বাদের জন্য সারা দেশে বিখ্যাত।

এবার বিখ্যাত মধুপুর গড়ের মধ্যকার রাস্তা ধরে গাড়ি এগিয়ে চললো। ভাওয়ালের রাজার স্মৃতি জড়িত এই মধুপুর গড়ের অন্য নাম হলো ভাওয়াল গড়।

চিকন ফিতার মতো রাস্তা চলে গেছে গড়ের বুক চিরে। দুই পাশে নিস্তব্ধ গভীর বনভূমি। উচু গাছগুলো রাস্তার উপর ঝুকে পড়ে ছাতার মতো ডালপালা মেলে রেখেছে। সূর্যের আলো অনেক উপরে, এই ডালপালার ছাতায় এসে আটকে পড়ে নিচে পৌছাতে পারছে না। ছায়া ছায়া অন্ধকারে ঢাকা পুরোটা পথ। এতোক্ষণ যে শাল ও গজারির বন দেখেছি, এই বনের কাছে তা শিশু প্রায়। কেমন একটা ভয় ধরানো অনুভূতি জাগলো মনে। মনে হলো, এ যেন বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী চৌধুরানীর* জঙ্গল অথবা রবিন হুড–এর *শেরউড ফরেস্ট*।

মনে হলো এখনি তলোয়ার বা তীর ধনুক হাতে ডাকাত দল রে রে করে তেড়ে আসবে।

গাড়ি এগিয়ে চলেছে বনের মধ্য দিয়ে। জনমানব শূন্য এলাকা। গাছে বানর ও হনুমান জাতীয় প্রাণী চোখে পড়লো। দিনের বেলায়ই গাড়ির সামনে দিয়ে দৌড়ে রাস্তা পার হলো শেয়াল। ওপাশ গিয়ে এমনভাবে ঘাড় বেকিয়ে আমাদের দিকে তাকালো যেন বলতে চাইছে তাদের এলাকায় আমরা অনধিকার প্রবেশকারী। বন ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠলো।

এক সময় মনে হলো সত্যিই যদি ডাকাত দল আমাদের দিকে ছুটে আসে তাহলে কিছুই করার থাকবে না।

দুলাভাইকে জানালে তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন, গভীর রাত হলেও এ কথা মানা যেতো। কিন্তু বেলা বারোটায় এ কথা ভাবা দিবাস্বপ্ন ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

গড় পার হতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় লাগলো।

বনের শেষ প্রান্তে দুলাভাইয়ের এক পরিচিত লোকের বাসায় আধা ঘণ্টার যাত্রা বিরতি ঘটলো। বিশালকায় বিদেশি স্টাইলের দোতলা কাঠের বাড়ি। নিচের তলাটা মোটা গুড়ি দিয়ে বানান হয়েছে। সেটা একদমই ফাকা রাখা হয়েছে বন্য জন্তুর হাত থেকে বাচার জন্য। প্রায়ই সন্ধ্যার পর এখানে বিভিন্ন জীবজন্তু এসে ঘুরে বেড়ায়। দোতলার বারান্দায় বসে বনের গাছপালার দিকে তাকিয়ে টাঙ্গাইলের পোড়াবাড়ির বিখ্যাত চম চম ও মুক্তাগাছার মণ্ডা দিয়ে চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল অপূর্ব।

এবারে ময়মনসিংহের উদ্দেশ্যে যাত্রা। বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ শহরে ঢুকে সোজা সিভিল সার্জনের কোয়ার্টারে এসে গাড়ি থামলো। দুলাভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ড. আলী আশরাফ এখানকার সিভিল সার্জন। আন্তরিক আলাপচারিতায় পথের ক্লান্তি দূর হলো।

সবাই মিলে বিশ্রাম নিয়ে বিকেলে শহর ঘুরতে বের হলাম। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর বাড়ি, ব্রহ্মপুত্র নদ দেখে সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরলাম।

এবার ফিরতি যাত্রা। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বিকাল সাড়ে পাচটা নাগাদ রওনা হলাম। এপৃলের শেষ। সূর্য ডুবতে দেরি আছে। আশা করা যায় সাড়ে সাতটার আগেই গড় পার হয়ে যাওয়া যাবে। বেলার দিকে তাকিয়ে গাড়ির গতি একটু বাড়িয়ে দিলেন দুলাভাই।

কিন্তু মুক্তাগাছার পার হওয়ার আগে গ্রাম্য হাট পড়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে গতি কমাতে হলো। এ কারণে যখন গড়ে এসে গাড়ি পৌছালো, ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেছে তখন চারপাশ। এমনিতে বনের মাঝে সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি নামে। ফলে গড়ে ঢুকতেই রাতের অন্ধকার আমাদের গাড়িকে জেকে ধরলো।

সারা দিনের যাত্রার ক্লান্তি তখন আমাদের দেহ ও মনে। তার মাঝে বড় গাছে ঘেরা বনের এ রাস্তা আমাদের মনের ওপর ক্রমেই যেন চেপে বসতে শুরু করলো। মনে হলো অশরীরী কেউ যেন বনের মাঝ থেকে আমাদের

দেখছে। এখনি হয়তো হাত বাড়িয়ে আমাদের ছুয়ে দেবে। এ কথা মনে আসতেই নড়েচড়ে উঠে বাইরে তাকানো বন্ধ করে চুপচাপ গাড়িতে বসে রইলাম। হঠাৎই আপা বলে উঠলেন, সামনে ওটা কিসের আলো।

তাকিয়ে দেখার আগেই তা মিলিয়ে গেল। দুলাভাই বললেন, হয়তো শেয়ালের চোখ হবে। যে কোনো বন্য প্রাণীর চোখই রাতে জ্বল জ্বল করে।

এবার আমি দেখতে পেলাম সেই লাল আলো। ভয়ে আমার গা কাটা দিয়ে উঠলো। কেননা শেয়ালের চোখ তো লাল নয়। দুই তিন সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী হয় না এই রহস্যময় লাল আলো।

এবার দুলাভাইও আমাদের সঙ্গে সেই আলো দেখতে পেলেন। পাচ ছয় মিনিট বিরতি দিয়ে একইভাবে সেই লাল আলো আমাদের গাড়ির সামনে জ্বলে উঠছে। কিন্তু দূরত্ব একই থাকছে। বাড়ছেও না আবার কমেও যাচ্ছে না।

রাতের ঘন অন্ধকারে জঙ্গলের মধ্যে এই রহস্যময় লাল আরো দেখে এবার আমাদের, বিশেষ করে ছোটদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। গাড়ির সামনে ওই লাল আলো মনে হলো যেন ভূতের চোখই হবে। ডাকাত হলে তো দল বেধে সবাই হাজির হয়ে যেতো।

এতোক্ষণ চুপচাপ থাকলেও এবার দোয়া–দরুদ পড়া শুরু হয়ে গেল গাড়ির মধ্যে। কিন্তু যতোই দোয়া পড়ি না কেন, ভূতের চোখ কিছুতেই আমাদের কাছ ছাড়া হতে চায় না। মনে হচ্ছে যেন আমাদের সে বিশেষভাবে পছন্দ করে ফেলেছে।

আবারও জোরে জোরে দোয়া পড়া শুরু করলাম।

দুলাভাই শক্ত হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং চেপে ধরে যতো দ্রুত সম্ভব গড় পার হওয়ার চেষ্টায় রত।

ফাহিমকে এক হাতে চেপে ধরে আছেন আপা।

কাচ বন্ধ গাড়িতে আমাদের সবার নিঃশ্বাসে বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এদিকে গাড়ির সামনে ঘন আধারের মাঝে চার পাচ মিনিট বিরতি দিয়ে ওই লাল আরো জ্বলে উঠছে।

এমনি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে আধঘণ্টা চলার পর গড় পার হয়ে গাড়ি সমতল এলাকায় ঢুকলো। সামনেই মধুপুর বাজার। আপা কাচ নামিয়ে দিতে এক ঝলক তাজা ঠাণ্ডা বাতাস গাড়ির বন্ধ বাতাসকে দূর করে দিল। আমরাও তাজা হাওয়া বুক ভরে টেনে নিলাম। এখন আর ভূতের ভয় আমাদের কাবু করতে পারবে না।

হঠাৎ দেখা গেল রাস্তার পাশে আবার সেই লাল আলো জ্বলে উঠলো। তার সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট নেয়ার শব্দ।

এক ঝলক এই দৃশ্য দেখে দুলাভাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

ওই লাল আলোটা আসলে একটা গাড়ির পেছনের টেইল লাইট। একটা লাইট নষ্ট থাকায় শুধু অন্যটা জ্বলেছে। আমরা অন্ধকার বনের রাস্তায় আকাবাকা পথে চলতে গিয়ে যাকে ভূতের চোখ বলে এতোক্ষণ ভয়ে আতকে উঠেছি সেটা আর কিছুই নয়, একটা নির্দোষ টয়োটা গাড়ির পেছনের লাল লাইট।

পরিণত বয়সে পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্র পরিবেষ্টিত সংসারে যখনই পৌত্রকে তার আবদার রাখতে গিয়ে ভূতের গল্প বলি তখন *মামদো* ভূতের গল্পের পাশাপাশি ওই লাল চোখের ভূতের গল্পটাও বলি।

আমার পৌত্র চোখ বড় বড় করে শোনে আর সবশেষে মতামত দেয়, দিদি, আসলে ভূত বলে কিছু নেই, তাই না। এটা হচ্ছে মিথ্যা ভূতের একটা সত্যি গল্প।

মিরপুর, ঢাকা থেকে

নোঙর ছেড়া

- সাইফুল ইসলাম বাবলু

সেনা কল্যাণ ভবনের এগারো তলা থেকে নেমে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো আনিস। পুরো চার ঘণ্টা লেগে গেল ফ্লাইট কনফার্ম করতে। রি-এন্ট্রি ভিসা আবার বাংলায় অনুবাদও করে আনতে হয়েছে। অথচ পাসপোর্টে ভিসার ওপর ইংরেজিতে স্পষ্ট করে লেখাই আছে *রি-এন্ট্রি বিফোর টোয়েনটি ডিসেম্বর ২০০২*।

এয়ারলাইন্স আর এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ কেন যে মধ্যপ্রাচ্য যাত্রীদের এতো হয়রানি করে? গতবার ছুটি কাটিয়ে ফেরার সময় এয়ারপোর্টে তো তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। ঘণ্টা দেড়েক লাইনে দাড়িয়ে থেকে কাউন্টারে পৌছেছি। পাসপোর্ট উল্টাপাল্টা দেখে ইমিগ্রেশন পুলিশ বললো, আপনার ভিসা তো এক্সপায়ারড। যেতে পারবেন না।

সেদিন বিয়ের মাত্র দেড় মাসের মাথায় স্ত্রীকে ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল কর্মস্থল সউদি আরবে। তারপর প্রবাসে দুটি বছরকে মনে হয়েছে আগের দশ বছরের চেয়েও দীর্ঘতর। দীর্ঘ বিরহের অবসান ঘটলো অবশেষে। পুনর্মিলনের সেই রাতে সে কি আনন্দ! দেহমনে সে কি উত্তেজনা!

পাসপোর্ট লুকিয়ে রাখলো শাহানা। আনন্দে তার চোখে পানি এসে গেছে। আচলে চোখ মুছতে মুছতে বললো, তোমাকে আর যেতে দেবো না।

আনিসের হৃদয়ে বাধভাঙা প্লাবন। প্রিয়তমা স্ত্রীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেধে সে বললো, না শানু, না। তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবো না।

সেদিনের সেই প্রতিশ্রুতি ভেঙে গেল। প্রমিজেস আর মেড টু বি ব্রোকেন। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস! হিরন্ময় সেই দিনগুলো বিবর্ণ, ফ্যাকাশে হয়ে গেল কি দ্রুত?

অনেক কাঠখড় পুড়ে ব্যবসাটা দাড়াচ্ছিল। বারো বছরের *এন্ড অফ সার্ভিস বেনিফিট* আর ব্যাংকে জমানো টাকার পুরোটাই শেষ। পজিশন, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন, এয়ারকন্ডিশনার, কমপিউটার, ইন্টারনেট সংযোগ এসবে লেগে গেল প্রায় সাত লাখ। দুটি আইএসডি টেলিফোন লাইন পেতে ঘুসই দিতে হলো পঞ্চাশ হাজার টাকা। ডেকোরেশন চলার সময় বিশ হাজার টাকা চাদা দাবি করলো সোনার ছেলেরা।

এলাকার কমিশনারকে অভিযোগ করলে বেশ বিজ্ঞের মতো বললেন, ছেলেদের একটু খুশি রাখতে তো হবেই।

তাদের খুশি করতে করতে আনিসের দফারফা। আজ *জোসেফ গ্রুপ* তো কাল *ন্যাংড়া বাদলের গ্রুপ*। পরশু *ককটেল বাবু*-র চিরকুট, এমপির সংবর্ধনা, তোরণ বানানো হবে। তাদের দাবি বিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার। দশ হাজারের নিচে হলো ফকিরের ভিক্ষা! তবু *আশা কমিউনিকেশন্স।* (আশা নামটি তার নিজের আর স্ত্রী শাহানার নামের অদ্যাক্ষর দিয়ে বানানো) নিয়ে আনিস আশান্বিত।

একাধিক ইন্টারনেট সংযোগ থাকায় প্রবাসী আত্মীয়ের সঙ্গে নিরিবিলি ও দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে গ্রাহকের সমাগম বাড়ছে। মোবাইল ফোনের প্-পেইড কার্ড বিক্রি হচ্ছে বেশ। ব্যাংক লোনটা পাস হলে আরো গোটা দশেক কমপিউটার কেনা যাবে। পেছনের দিকটা বাড়িয়ে সাইবার ক্যাফে বানালে দারুন হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় এলো এক নব্য মাস্তান। মোটর সাইকেলের চাবি তর্জনীতে ঘোরাতে ঘোরাতে বললো, *ফোনডা দ্যান তো। ব্যাংকক-এ কল করুম। বসের লগে কথা কওন লাগবো।*

আনিস শান্ত গলায় বললো, আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। সবগুলো লাইন এনগেজড।

অই মিয়া, কইলাম না বসের লগে কথা কমু? নিজের মোবাইল ফোনের বাটন টিপতে টিপতে ধমক দিল নব্য মাস্তান।

আনিস একজন কাস্টমারকে অ্যাটেন্ড করছিল। সুতরাং তাকে অগ্রাহ্য করতে হলো। আনিসের জন্য সেটাই হলো কাল। আধা ঘণ্টার মাথায় আরো দুজনকে নিয়ে ফিরে এলো নব্য মাস্তান। *ঠাস ঠাস, পটাস পটাস* শব্দে ভীত সন্ত্রস্ত কাস্টমাররা দৌড়ে বেরিয়ে গেল। কমপিউটার, কাচের দরোজা, পার্টিশন ভেঙে চুরমার করে দিল নিমেষে।

বাধা দিতে গেল আনিস। কিন্তু মাথায় রডের বাড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো।

প্রচুর রক্তক্ষণ হয়েছে মাথা ফেটে। হাসপাতালে আনিসের জ্ঞান ফিরলো গভীর রাতে। দেখলো তার একটি হাত বুকে চেপে ধরে নিঃশব্দে চোখের পানি ফেলছে শাহানা।

নাহ, এখানে কিছুই করা সম্ভব না। *আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।* আহারে সোনার বাংলা! তা কি দিচ্ছো তুমি ভালোবাসার বদলে?

রূঢ় সিদ্ধান্তটি ওই সেদিনই নেয়া হয়ে গেছে হাসপাতালের বেডে হুশ ফিরলো যখন। ফিরে যেতে হবে আমার। ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন। আনিসের জন্য সউদি আরবই প্যাভিলিয়ন।

ভাগ্যিস পালিয়ে বাচার একটি পথ খোলা ছিল? দেশে আসার সময় ফাইনাল এক্সিট-ই চেয়েছিল সে।

পোড় খাওয়া জেনারেল ম্যানেজার বোধহয় তার নিষ্ঠা ও সততার কদর করতেন। তিনি বললেন, দেখো আনিস, তোমাকে এন্ড অফ সার্ভিস বেনিফিট পুরোটাই দিয়ে দিচ্ছি। উইথ সিক্স মানথস এক্সিট অ্যান্ড রি-এন্ট্রি ভিসা। দেশে গিয়ে সেটল করতে না পারলে চলে এসো। ডোরস আর ওপেন ফর ইউ।

কয়েকদিন ধরে শাহানার মুখে হাসি নেই। তার ম্লান মুখের দিকে তাকানো যায় না। বুকের ভেতরটা প্রচণ্ড কষ্টে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। মাস খানেক হলো অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে সে।

আবার দুই বছর পর দেশে ফিরবে যখন, শিশু সন্তানের কোমল স্পর্শে আবেগে আপ্লুত হবে আনিস। তার আনন্দ অশ্রু ছোট্ট শিশুর গাল ভিজিয়ে দেবে। তারপর? জন্ম নেবে দ্বিতীয় সন্তান? সংসারের খরচ বাড়বে। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

লাখ লাখ মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসীর মতো সেও কি তাহলে ফিরে যাবে বার বার পরবাসে? দেশে আর নোঙ্গর ফেলা হবে না?

ফুপিয়ে কাদতে কাদতে শাহানা এখন হেচকি তুলছে।

তার একটি হাত দুই হাতের মুঠোয় ভরে নির্বাক বসে আছে আনিস। ট্যাকসি ক্যাব ছুটে চলছে শা শা। একটু পরেই এয়ারপোর্টে পৌছে যাবে। সে ভাবছে, ইশ! আরো ঘণ্টা খানেক যদি এভাবে বসে থাকা যেতো শানুর হাত ধরে! এয়ারপোর্টে গিয়ে তো তার সঙ্গে নিরিবিলি একটু বসাও যাবে না। বুকের মাঝখান থেকে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে গলার কাছে এসে আটকে যাচ্ছে।

গাড়ির জানালা দিয়ে সে আকাশের দিকে তাকালো। ডিসেম্বরের সকাল। তবু আকাশে মেঘ। মেঘের আড়ালে সূর্য কি ভীষণ ম্লান, বিষণ্ন!

সউদি আরব থেকে
saifnilu2002@yahoo.co.uk

আম আর দুধ

- মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান কামাল

একদিন সকাল দশটার দিকে আমরা দুই তিনজন আমাদের গলির মুখে দাড়িয়ে আছি। দেখলাম গলির ভেতর থেকে একটা রিকশা আসছে। আমরা রিকশাটি যাওয়ার জন্য জায়গা করে দিতে পাশে সরে দাড়ালাম। কিন্তু রিকশার আরোহীকে দেখে চোখ আটকে গেল। তার মুখের দিকে ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে থাকি। গায়ের

ড্রেস দেখে বুঝলাম সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মানুষ এতো নিখুত সুন্দর হতে পারে? ঈশ্বর হয়তো নিজ কুদরতি হাতে মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

দ্রুত গতিতে রিকশাটি আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল। আকস্মিকভাবে নিজের ভেতর প্রবল চাঞ্চল্য অনুভব করলাম। আমাদের বাসার সামনেই বাবুদের বাসা। বাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েটির কথা। কারণ এসব আবার বাবুর নখদপর্ণে। কোন মেয়ের বাসা কোথায়, কে কোন কলেজে কোন ইয়ারে পড়ে, ইত্যাদি।

বাবুকে জিজ্ঞাসা করতেই সে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে দিল। মেয়েটির বাসা আমাদের গলির ভেতরেই। এ মাসের প্রথম দিকে সূচনাদের বাসার দোতলায় উঠেছে। তার বাবা উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা। বাবুদের সঙ্গে নাকি একই ব্যাচে প্রাইভেট পড়ে। বাবুকে বললাম আমার পছন্দের কথা।

বাবু বললো, যতোদূর সম্ভব আপনাকে হেলপ করবো।

মেয়েটির নাম জানতে চাইলে বাবু বললো, সুমিত্রা।

মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো।

বললাম, এ ধরনের নাম তো হিন্দুদের হয়।

বাবুর সহজ সরল উত্তর, হিন্দুই তো।

ইলেকট্রিক শক খেলাম। চমকে উঠলাম। সমস্ত অন্তরাত্মা শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেল। এ কি করে সম্ভব? সুমিত্রা কি মেনে নিতে চাইবে আমাকে? হাজারও জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে উকিঝুকি মারছিল। তারপরও হাল ছাড়লাম না।

বাবুকে বললাম, যেভাবেই হোক, সুমিত্রাকে আমার চাই।

পরের দিনই প্রাইভেট পড়তে গিয়ে বাবু আমার ভালো লাগার কথা বললো সুমিত্রাকে। বাবু এভাবে প্রস্তাব দিল যে, সুমিত্রা, মনে করো তোমাকে একটা ছেলের ভালো লাগলো। ইতিমধ্যে ভালোবেসে ফেলেছে। মনে করো, ছেলেটা মুসলমান। গায়ের রঙ শ্যামলা। তবে দেখতে শুনতে মোটেও অসুন্দর নয়। সে তোমাকে সব কিছুর বিনিময়ে পেতে চায়। প্রয়োজনে ধর্মান্ত...।

সুমিত্রা থামিয়ে দিল বাবুকে।

বাবু লক্ষ্য করলো, কথাগুলো শুনে সুমিত্রার নাকের ডগায় ঘাম জমে উঠেছে।

দেখো বাবু, তুমি যা বলেছো ভালোবাসার ক্ষেত্রে এসব কোনো বাধাই মনে করি না। আমি বুঝি হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, কৃশ্চিয়ান সবই উপরওয়ালার সৃষ্টি। ভালোবাসা জাত, ধর্ম, বর্ণ, বয়স, সুন্দর অসুন্দরকে পরোয়া করে না। মনের ব্যাপারটাই এখানে মুখ্য।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলেছিল বাবুকে।

তাহলে তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি? বাবুর উৎসুক জিজ্ঞাসা।

সেটা পরের কথা। আগে শুনি ছেলেটা কে? অবশ্যই তুমি নও তো?

আরে না, আমাদেরই পাড়ার এক বড় ভাই। এ বছর অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। বাবুর উত্তর।

তাকে অবাক করে দিয়ে সুমিত্রা বললো, আমি রাজি।

বাবুর কথায় আমিও অবাক হলাম। একটা হিন্দু মেয়ে কাউকে না দেকে জাত-কুল, ধর্ম-বর্ণ সব কিছু তার প্রতিকূলে জেনেও কিভাবে রাজি হয়ে গেল!

সুমিত্রার প্রতি আমার বিশ্বাস, আস্থা ও ভালোবাসার টান আরো বেড়ে গেল। বাবুর কথা মতো পরের দিন সুমিত্রার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম দুর্গা সাগরের পাড়ে।

নয়টার দিকে সেখানে গিয়ে পৌছলাম।

বাবু আর সুমিত্রা এলো পৌনে দশটার দিকে।

এই পয়তাল্লিশটি মিনিট যেন মনে হয়েছিল পয়তাল্লিশ বছর।

যাহোক, সুমিত্রার হাতে ছিল এক গোছা রজনীগন্ধা।

আমি নিয়েছিলাম গোলাপের তোড়া, সঙ্গে চোদ্দটি চকোলেট।

প্রথমে ফুল বিনিময়। তারপর থেমে থেমে কিছু কথা।

এক পর্যায়ে বললাম, সুমিত্রা, তোমার তো ক্লাস ফাকি দিয়ে এখানে আসার কথা। তাহলে তো তোমার পরনে থাকার কথা কলেজ ড্রেস। কিন্তু নীল শাড়ি, নীল ব্লাউজ, নীল টিপ এসবের মানে তো বুঝলাম না।

সুমিত্রা ভরাট কণ্ঠে বললো, তুমি তো জানো, কষ্টের রঙ নীল? তুমি যদি কখনো আমায় কষ্ট দাও তখন যেন এই নীলের সঙ্গে মিশে যেতে পারি। তাই এই নীল দিয়েই তোমাকে আজ অভিষিক্ত করলাম।

উৎসুক দৃষ্টিতে শুধু চেয়ে রইলাম সুমিত্রার দিকে। তার কথার জবাবে কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। মনটা আশ্চর্য এক মমতায় ভরে গেল। গভীর কৃতজ্ঞতায় হাত ধরি সুমিত্রার।

সে হাত ছাড়িয়ে নিতে চাইলো।

ছাড়লাম না।

বাবু এসব দেখেও না দেখার ভান করে অন্যত্র চলে গেল।

একটা সিগারেট ধরাতে চাইলাম।

সুমিত্রার কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

সেদিন থেকে সিগারেট ছাড়লাম।

কিছুক্ষণ পরে বাবু এলো। এবার বাসায় ফেরার পালা। দুটো রিকশা ডেকে একটাতে বাবুকে উঠিয়ে দিয়ে আমরা দুজন অন্য রিকশাটাতে উঠলাম।

বাবু বললো, হ্যা, এটাই তো নিয়ম। আম দুধ মিশে গেলে আমের আটিটা এভাবেই ছিটকে যায়।

হেসে উঠলো সুমিত্রা।

আমিও হাসি থামাতে পারলাম না।

কলেজ এভিনিউ, বরিশাল থেকে

সন্ন্যাসীর পাল্লায়

- এস.আর গালিব

আমি তখন সবেমাত্র ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র। যৌবনের শুরু। মনে উড়ু উড়ু ভাব। কথায় আছে *ফার্স্ট ইয়ার, ডোন্ট কেয়ার*। আমার তখন সে রকম অবস্থা। রিকশা ছাড়া পায়ে হেটে পথ চলি না। চোখে কালো সানগ্লাস। গায়ে পারফিউমের মন মাতানো তীব্র গন্ধ। প্যান্টের ব্যাক পকেটে সুদৃশ্য মানিব্যাগ, মাথায় ক্যাপ।

বংশের বড় ছেলে আমি।

ছোট চাচা বলেছিলেন, ডিভিশন নিয়ে এসএসসি পাস করলে একটি রিস্টওয়াচ কিনে দেবেন।

সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছি। তাই রিস্টওয়াচ নেয়ার জন্য চাচার বাসায় এসেছি। চাচা একটি কেমি রিস্টওয়াচ কিনে দিলেন।

অনেক দিন পর চাচার বাসায় বেড়াতে আসায় জামাই আদর পেলাম। চাচাতো ভাইবোনদের সঙ্গে হেসে-খেলে বেড়িয়ে কিভাবে যে দিনগুলো কেটে গেল তা বুঝতে পারলাম না।

এবার বাড়ি ফেরার পালা। মনে হয় তখন ১৯৬৭ সাল হবে। খুব সম্ভবত হেমন্তকাল। চাচা-চাচি, চাচাতো ভাই-বোনদের কাছ থেকে বিদায় আদায় নিয়ে পথে নামলাম। সবার চোখ অশ্রুসজল।

এবার একটি রিকশা নিয়ে রেল স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। চাচাবাড়ির শহর থেকে স্টেশনের দূরত্ব তিন কিলোমিটার। ফসল কাটার মরসুম বলে চারদিকে খুশির আমেজ। কেউ যাচ্ছে স্টেশনে ট্রেন ধরতে আবার কেউ বা বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছে।

স্টেশনে পৌছে দেখি সবেমাত্র ট্রেন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ভিড়ছে। এটা জাংশন স্টেশন। এখানে ট্রেন পানি ও কয়লা নেয়ার জন্য আধা ঘণ্টা অপেক্ষা করবে।

টিকেট কাউন্টার থেকে একটি ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কেটে স্টেশনে ঢোকার উদ্দেশ্য ওভারবৃজের দিকে রওনা দিলাম।

আসার সময় চাচি দশটি টাকা হাত খরচ বাবদ দিয়েছিলেন। পকেট তখন গরম আর কি! টিকেট কেনার পরও আমার পকেটে তখন আট নয়টি টাকা অবশিষ্ট রইলো।

ওভারবৃজের সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে ওভারবৃজ অতিক্রম করছি। এমন সময় আমার সামনে উপস্থিত হলো এক গেরুয়া বসন পরিহিত, শুভ্র দাড়ি মণ্ডিত, লম্বা চুল বিশিষ্ট জটাধারী আধা বয়সী সন্ন্যাসী। তার এক হাতে একটি ভৈরবী চক্র। অন্য হাতে একটি টাকা তোলার দান বাক্স এবং কাধে একটি বহু রঙয়ের তালিকাযুক্ত ঝোলা।

সন্ন্যাসী আমার সামনে দাড়িয়ে বলতে আরম্ভ করলো, *খাজা বাবাকে ওয়াস্তে কুছ দিজিয়ে, খাজা বাবাকে ওয়াস্তে কুছ দিজিয়ে। আপকা সব মকসুদ ভি পুরা হো যায়েগা। যা আপ মাংতা হ্যায়* ইত্যাদি।

খাজা বাবার নাম শুনে ভক্তিভরে মনোবাঞ্ছনা পূরণ হওয়ার আশায় তার দান বাক্সে একটি সিকি ফেললাম।

এরপরই শুরু হলো তার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা আমার আপাদমস্তকে ঘন ঘন মর্দন। সেই সঙ্গে বলতে আরম্ভ করলো, *ম্যায় আভি সামঝা আপ কলেজ মে, ভার্সিটিমে পড়তা হ্যায়, আপতো থোরা দিনকে বাদ ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার, জজ, ব্যারিস্টার আওর বড়া আদমি বন যায়েগা।* সেই সঙ্গে বিড় বিড় করে অনুচ্চ সরে সে আমার সারা শরীরে ফু মারতে আরম্ভ করলো।

লোকটি ঐন্দ্রজালিক কি না জানি না। ফু মারার কিছুক্ষণের মধ্যে আমার শরীর অবশ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতো আমার মনে ছবি আলোকিত হলো। আমার চোখের পাতায় ভিডিও ফিল্ম চলা শুরু করেছে।

সেলুলয়েডের পাতায় দেখছি, আমি স্ট্যান্ড করে ইন্টারমিডিয়েট পাস করলাম। আমাদের বাসায় সাংবাদিক ও ফটো সাংবাদকিদের ভিড়। তারা আমার পিতা মাতাকে সঙ্গে নিয়ে সাক্ষাৎকার নেয়াসহ বিভিন্ন পোজে ফটো তুলতে ব্যস্ত। দেখতে পেলাম পরদিন দেশের জনপ্রিয় সংবাদপত্রে আমার ছবি ছাপাসহ কৃতিত্বের কথা ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছে। চারদিকে সবাই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। আবার কেউ কেউ মন্তব্য করলো বাঘা ছেলে বটে।

বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি, মেডিকাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও কৃষি ইউনিভার্সিটি আমাকে স্টাইপেন্ডসহ ভর্তি করে নিতে আগ্রহ দেখালো। শেষে দেশের বিখ্যাত ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম।

চার বছর পর আবারও অনার্সসহ প্রথম হয়ে ইউনিভার্সিটির সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করলাম। ভাইস চ্যান্সেলর এই ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করার প্রস্তাব দিলেন।

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ধনী, সম্মানীয় ব্যক্তিরা তাদের বিয়েযোগ্য মেয়ের জামাই বানানোর জন্য আমার পিতা মাতার কাছে প্রস্তাব পাঠাতে লাগলো।

শেষে এক ধনী সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিদুষী সুন্দরী কন্যার সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হলাম।

মধু পূর্ণিমা যাপনের পর শ্বশুরের টাকায় উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশ যাবার পালা। নির্দিষ্ট দিনে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বিদায়বেলা সবাই অশ্রু সজল চোখে বিদায় জানালো।

কয়েক ঘণ্টা পর লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে নামলাম। সে এক হাই–ফাই ব্যাপার!

পৃথিবীর বিখ্যাত অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে পড়ছি। সেখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। এই সব সুখ স্বপ্নে আমি যখন বিভোর তখন সন্ন্যাসী তার ঝোলা থেকে একটি তাবিজের উপকরণ বের করতে ব্যস্ত।

আমার ভিডিওর ফিতা চলা শেষ হচ্ছে না।

সন্ন্যাসী তখন একটি পাতলা কাগজে আরবিতে ছাপা তাবিজ বের করে আমার চোখের পর্দার সামনে নাচাচ্ছে। আর বলছে, *বেটা, ইধার দেখ, এ ছোটা কাগজমে তুমাহারা জিন্দেগি ভি দেখা যাতা হায়। মেরা নজরমে আতা হ্যায় আপ বহুত বড়া আদমি বন গেয়া।*

আমার তখন কোনো হুশ নেই। কেবল সুখ স্বপ্ন দেখে চলেছি।

আমার এই সম্মোহিত অবস্থা দেখে সন্ন্যাসী বার বার বলছে, *বেটা আব মেরা আখমে তুমহারি আখ রাখ, আওর এ কজব ভি সাচ্চা নিয়ত করকে আপকা বাজু মে বাধ কে রাখ।*

এমন সময় অন্য কোনো যাত্রীর ব্যাগের গুতায় আমার ধ্যান ভঙ্গ হলো। *অ্যা অ্যা* শব্দ করে আমার চেতনা ফিরে পেলাম।

আমার সামনে তখন সন্ন্যাসী মুচকি মুচকি হাসছে। এই ফাকে তার হাতের ওই তাবিজ তার মাদুলিতে ভরতে ব্যস্ত। তারপর তা আমার ডান হাতের বাহুতে বেধে দিয়ে বললো, *আভি তোমহারা সব মকসুদ ভি পুরা হো যায়েগা।*

আমি তখন সম্মোহিত ব্যক্তির মতো আমার হাতে বাধা মাদুলি নেড়ে–চেড়ে দেখছি।

সেও সুযোগ বুঝে বললো, *আভি মাদুলিকা কিম্মত দিজিয়ে।*

বললাম, *কিস্মত কিতনা।* সে প্রতিউত্তরে বললো, থোড়া। সেরেফ পাচ রুপাইয়া।

সন্ন্যাসীর কথা মতো পাচটি টাকার একটি নোট তার হাতে গুজে দিয়ে ট্রেনের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালাম।

সেকালে এখনকার মতো ট্রেনে সিট নাম্বার ছিল না। আর লোকে সচরাচর তেমন একটা ফার্স্ট ক্লাসে ভ্রমণ করতো না। কারণ তখন ট্রেনে এখনকার মতো ভিড় হতো না। আমি যে কামরায় উঠলাম সে কামরায় সিট সংখ্যা মাত্র আটটি। এই কামরায় আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো যাত্রী নেই। জানালার পাশে সিট নিয়ে ওভারবৃজের দিকে মুখ করে বসলাম। ইতিমধ্যেই আরো একটি ট্রেন স্টেশনে এসে ভিড়েছে। কেউ কেউ ট্রেন থেকে নামছে আবার কেউ কেউ ট্রেনে ওঠার জন্য দরজায় দাড়িয়ে। রেল কুলিদের খুবই ব্যস্ততা। কার আগে কে উঠবে বা কার আগে কে নামবে তার কসরত চলছে।

স্টেশনে ফেরিওয়ালাদের বেজায় ভিড়। কেউ বা বাদামওয়ালা, কেউ বা পান–সিগারেট বিক্রেতা, আবার কেউ বা ওষুধ বিক্রেতা। সবাই যার যার ধান্দায় ব্যস্ত।

তাকিয়ে তাকিয়ে এসব দৃশ্য দেখছি। পরক্ষণেই মন তোলপাড় করতে আরম্ভ করলো। কারণ যেখানে যাবো সেখানে যেতে ট্রেন থেকে নেমে আরো ছত্রিশ মাইল পথ বাসে যেতে হয়। ভাড়া দুই তিন টাকা। সারা পথ তো রয়ে গেছে। বাস ভাড়া বাদ দিলে আমার কাছে চা নাশতা বা খাবার খরচের অতিরিক্ত তেমন টাকা নেই। এসব কথা চিন্তা করতে করতে ওভারবৃজের দিয়ে তাকিয়ে আছি।

মনে মনে ভাবলাম কেন ইমোশনালি হয়ে একটা মাদুলি কিনে পাচটি টাকা হারালাম।

ট্রেন ছাড়তে তখনো পনেরো মিনিট বাকি। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি ওই সন্ন্যাসীর দিকে। লক্ষ্য করলাম, সে সবাইকে ধরছে না। আমারই মতো যারা বোকা, ইমোশনাল বা যাকে সে সম্মোহন করতে পারবে, বেছে বেছে তাদেরই আটকাচ্ছে। আমারই মতো তাদের লোভ দেখিয়ে ও সম্মোহিত করে টাকা পয়সা আদায়সহ মাদুলি গছিয়ে দিচ্ছে।

ওই সব দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে হতবাক। কিছু ভুল আমি এর আগে করে ফেলেছি। এটা তো বড় এক ধরনের অভিনব প্রতারণা ব্যবসা। খাজা বাবার মতো একজন বিখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তির নাম ভাঙিয়ে সেই এই অভিনব প্রতারণা ব্যবসা ফেদে বসেছে। কিন্তু এখন তো আর করার কিছু নেই।

এরই মধ্যে আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই কামরায় আমার মতো আরো তিন চারজন যাত্রী উঠেছেন। তারা সবাই গল্পে ব্যস্ত।

স্বাভাবিক হতে পারছি না। শুধুই ভাবছি। এই পৃথিবীতে মানুষ কতো রকম ফিকির করে জীবিকা নির্বাহ করছে যার অধিকাংশ সৎ নয়।

মানুষ শিক্ষিত হলেই সবক্ষেত্রে বুদ্ধিমান হয় না। লোকটি তো শিক্ষিত নয়। কিন্তু আমি একজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র হয়েও এক অশিক্ষিত সন্ন্যাসীর ধোকার শিকার হলাম কিভাবে? মনে মনে স্বীকার করলাম, *শিক্ষিত হলেই সবাই বুদ্ধিমান হয় না।*

আজ ত্রিশ বছর পর সে কথা স্মরণ হলে হাসি পায়। কারণ মাদুলি ধারণ করে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায় না। ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হলে মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করে ভালো রেজাল্ট করতে হয়। এবং তার সঙ্গে ভাগ্য সদয় হওয়া প্রয়োজন।

সন্ধ্যার সময় সারা দিন অভুক্ত অবস্থায় বাড়ি পৌছালাম।

মা বললেন, তোর মুখ শুকনা কেন? সারা দিন বুঝি কিছু খাসনি?

প্রতিউত্তরে কিছু বললাম না।

দুই তিন দিন পর মনের অবস্থা স্বাভাবিক হলে বাসার সবাইকে সব খুলে বললাম।

সবাই হেসে উঠলো। অনেকে বোকা বললো। আবার অনেকে বললো, জীবনে না ঠকলে চালাক হওয়া যায় না।

হয়তো শেষের কথাটাই সত্য। মাদুলি কেনার সময় যদিও নিয়ত ছিল জীবনে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। কিন্তু দুর্ভাগ্য বটে, কোনোটাই হইনি।

বাহুবল, হবিগঞ্জ থেকে

সোনামণি পাগলি

আমার অ–নে–ক আদর ও ভালোবাসা নিও। কেমন আছো জানি না। তবে আমার ভালোবাসার বিশ্বাসে বলছি, নিশ্চয় তুমি শিশিরে ভেজা ভোরের স্পর্শহীন গোলাপ কলির মতোই ভালো আছো। আমি কেমন আছি তা এ লেখাটি পড়েই বুঝে নিও। শাহজাহান যেমন তার প্রিয়তমার জন্য তাজমহল তৈরি করেছিল ভালোবাসার জন্য, তেমনি তোমার জন্য আমি কিছুই করতে পারিনি। সম্রাট শাহজাহানের মতো আমার কোনো সামর্থ নেই যে, আমার সোনামণির জন্য তাজমহলের মতো কিছু একটা তৈরি করবো। কিন্তু একটা কিছু তোমাকে উপহার দেয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল।

তোমাকে ছেড়ে আসার পর আমার মনের ভালোবাসার অব্যক্ত আবেগগুলোকে কিছুতেই চেপে রাখতে পারছিলাম না। জানি না এটা আবার কোন কষ্ট! আগে তোমাকে কাছে না পাওয়ার একটা কষ্ট ছিল। কিন্তু এখন কাছে পেয়েও দূরে থাকার কষ্ট আমাকে তিলে তিলে হজম করছে।

ঢাকায় এসে ভীষণ কষ্ট অনুভব করছি। সুখের দিনগুলো কেন এতো তাড়াতাড়ি শেষ হয় বলো তো? কাজকর্মে কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। যেখানেই তাকাই সেখানেই তোমার সুন্দর মুখের ছবিটা ভেসে ওঠে। তোমার চোখ, তোমার মায়াবী হাসি, তোমার আদর, তোমার চুমু, তোমার দুষ্টামি, তোমার আদুরি ছোট ছোট কথাগুলো, তোমার অভিমানি মুখখানি, চুলের ঐশ্বরিক সুবাস একটি সেকেন্ডের জন্যেও ভুলতে পারছি না।

সময়টাকে মনে হয় কেউ বেধে রেখেছে। সে কিছুতেই যেতে চায় না। এক একটি সেকেন্ড এক একটি বছরের চেয়েও বেশি বড় মনে হয়। কেন আমার এমন হচ্ছে জানি না। তোমাকে বেশি ভালোবাসি বলেই কি আমার এমন হচ্ছে?

আচ্ছা বলো তো, আমার মতো তোমারও কি এমনটি হচ্ছে? কষ্ট হলেও সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই স্বর্গীয় প্রেমকে স্বার্থক রূপে দিয়েছে। তোমাকে জীবন সঙ্গী করে পেয়ে আমি ধন্য। আমার ভালোবাসা কখনো তোমাকে অসুখী করবে না।

তোমার কাছে একটি অনুরোধ, জীবন চলার পথে কখনো যদি কোনো বাধা আসে তাহলে আমার ভালোবাসাকে অমর্যাদা করে চলে যাবে না সোনামণি।

এতো ছোট জীবনে তোমাকে ভালোবেসে কিছুতেই সাধ মিটবে না। এ জন্য আফসোস থেকেই যাবে। মৃত্যুর পর যদি কোনো জীবন থাকে তাহলে সে জন্মেও বিধাতার কাছে তোমাকে চাইবো।

ছোটবেলা থেকেই মাকে হারানোর বেদনা নিয়ে বড় হয়েছি। অনেক দুঃখ আর কষ্ট নিয়ে আজ এ পর্যন্ত এসেছি। আমি আমার জীবনের সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি। আমার চারপাশে অনেক শত্রু। তাই তাদের কোনো কথায় তুমি বিশ্বাস করবে না। কারণ কেউ চায় না আমরা সুখী হই। অন্যের সুখ কেউ যে সহ্য করতে পারে না তা তো বেশ ভালো করেই জানো।

আমার কর্মব্যস্ততার কারণে যদি ঈদে আসতে না পারি তাহলে মন খারাপ করবে না। কারণ আমি বাধ্য আমার কর্মের আনুগত্যতায়, আমি বন্দী আমার পেশার সুশৃঙ্খল জিঞ্জিরে। সর্বোপরি আমার আদর, চুমু ও ভালোবাসা সব সময় তোমার সঙ্গী হয়ে থাকবে। একদিকে যেমন নিদারুণ একাকীত্বের অনুভূতি, অন্যদিকে তুমি, এই পরিস্থিতি থেকে কবে মুক্ত হবো জানি না।

ভালো থেকো, সুস্থ থেকো আর নিয়মিত চিঠি লিখো। তুমি চিঠি না লিখলে আরো বেশি একা লাগে। Happy Eid Day। ঈদ মুবারক।

তোমার আনাড়ি **পাগলা**

মিরপুর, ঢাকা থেকে

মেরাজ ফকিরের বিলাসিতা

- নূরু

বিকেলের সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ হই। আজও হলাম। খুব মগ্ন হয়ে বিকেলের সৌন্দর্যটাকে উপভোগ করছি। কিন্তু মেয়েটির ডাকে আমার মগ্নতা ভেঙে গেল।

ভালোভাবে মেয়েটাকে লক্ষ্য করছি। তার চোখের পাপড়ির ফাকে ফাকে অশ্রুকণা দেখতে পেলাম।

মেয়েটা আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, ভাইয়া কয়টা বাজে?

আমার ঘড়ি নেই। কেবল বিরক্তি লাগে বলে ঘড়ি পরি না। চারপাশ তাকিয়ে বিজ্ঞের মতো বলে দিলাম, সাড়ে পাচটা।

মেয়েটার ধারণার সঙ্গে হয় তো আমার ধারণা মিলে গেছে। তাই একটা নিশ্চিন্ত ভাব তার চোখে-মুখে বিরাজ করছে। মেয়েটি বিড় বিড় করছে। মনে আমার প্রশ্ন জাগছে, বাজে মেয়েছেলে নয় তো? আবার মেয়েটার চোখের জল সে চিন্তাটাকে একেবারে উড়িয়ে নিয়ে গেল। আমার স্বস্তি লাগছে কেন যেন।

মেয়েটা যাচ্ছে না, দাড়িয়ে আছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কাদছেন কেন?

একজনের আজ আসার কথা। আমাদের বিয়ে হওয়ার কথা। সে হয়তো আর আসবে না।

একটু দম নিয়ে আবার বললো, জানেন, আজ আমি কোথায় থাকবো জানি না।

হয়তো মেয়েটা আমার মাঝে নির্ভরতা খুজে পেয়েছে। হয়তো ভেবেছে, আমি খুব কোমল মনের মানুষ। আসলে আমি কোমল মনের নই। মাঝে মধ্যে আমার মনে নিষ্ঠুরতা জেগে ওঠে।

আমি চাইলে আজকে রাতে মেয়েটিকে থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আজকে কেন, তার যদি কোথাও যাবার জায়গা না থাকে, একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

এ শহরে আমার একজন পেয়ারের লোক মেরাজ ফকির। আর দশজন ফকির থেকে মেরাজ ফকির ভিন্ন। সূক্ষ্ণ দৃষ্টি না থাকলে তা বোঝা যাবে না। মেরাজ ফকির ভিক্ষা করে দুটো এতিম মেয়ে পালে। তাদের হাতের কাজ শেখায়। তিনি স্বপ্নও দেখেন এ মেয়ে দুটোকে ধুমধাম করে বিয়ে দেবেন। তাদেরকে ঘরের নাতি-নাতনি নিয়ে আদরে-আহ্লাদ বাকি দিনগুলোর কাটাবেন। তিনি মেয়ে দুটোকে বড়মা, ছোটমা বলে ডাকেন। তাকে আমার বড্ড সাহসী মানুষ মনে হয়।

আমাকে দেখলেই বলেন, স্যার, বেহেশতের টিকেট কাটছি।

তার সঙ্গে প্রতি মাসের শেষে আমার দেখা হয়। যেদিন তার সঙ্গে দেখা হয় সেদিন তাকে বলি, খালি তো নিজের বেহেশতের টিকেটের ব্যবস্থা করেছেন, আমার জন্যও কিছু করেন, বেহেশতে কি যাওয়া দরকার না?

মেয়েটাকে যদি মেরাজ ফকিরের কাছে দিয়ে আসি, তিনি চমৎকার খুশি হবেন এবং খুশিতে গদ গদ হয়ে বলবেন, স্যার, আপনার টিকেটও হয়ে গেছে।

মেয়েটার প্রতি আমার আগ্রহ জন্মেছে বিপুলভাবে। তার বিস্তারিত জানার জন্য আমার মনের ভেতর ঝড় আরম্ভ হয়েছে মেয়েটা বোধহয় তা টের পায়নি। তারপরও সে বলা আরম্ভ করলো।

খুব গরিবের ঘরে তার জন্ম। অভাব-অনটন নিত্যসঙ্গী। বয়স যখন পাচ, একদিন এক মেলায় গিয়ে হারিয়ে যায় সে। অচেনা জায়গায় হারিয়ে গিয়ে সে কাদতে থাকে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ষোল সতেরো বছরের এক ছেলে তার কাছে এসে বলে, চলো আমার সঙ্গে।

মেয়েটা চলে এলো সে ছেলের সঙ্গে।

সে ছেলেরা পাচ ভাই, কোনো বোন নেই। একটা বোনের জন্য তাদের হা-পিত্যেশ অনেক সময় করুণ গানের মতো শোনা যায়।

ছেলেটার বাবা ব্যবসা করেন। রাতে মদ খেয়ে ফিরে এলে তখন তাদের ঘরে যেন জীবন্ত দোজখ নেমে আসে। জামাই-বৌ নিজেদের মধ্যে তুমুল বিশ্রী ঝগড়ায় লিপ্ত হয়। জগতের তাবৎ কুৎসিত গালি তখন একজন থেকে অন্যজনে দেয়া-নেয়া হয়। আর পাশের রুম থেকে ছেলেরা জেগে জেগে তা শুনে রাত পার করে।

মেয়েটাকে পেয়ে ওই ঘরে কিছু দিনের জন্য আনন্দের ঢেউ বয়ে যায়। ভাইয়েরা তার মধ্যে বোনের ছায়া খুজে পায়। বাবা মাও তার মধ্যে মেয়ের আদল দেখে।

বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, মাগো, তুই আমার মা, তোরে আমি লাল টুকটুক শাড়ি পরিয়ে বিয়ে দেবো।

অথচ এ মানুষটা প্রায় রাতে মদ খেয়ে মেয়ে মানুষের উষ্ণ স্পর্শ শেষে বাড়ি ফেরেন।

তার বৌও হরহামেশা কলংকিত স্পর্শ দিয়ে এবং পেয়ে বেড়ান।

আনন্দে আর খুশিতে তার কান্না পেতো খুব। তিন বেলা পেট পুরে মাছ মাংস দিয়ে ভাত কেবল তার কাছে স্বপ্ন ছিল। তাই সহসা নিজের বাবা মাকে ভুলে গেল সে। নতুন বাবা-মা, ভাইদের নিয়ে তার দিনগুলো কাটতে লাগলো।

অনেক কিছুর পরিবর্তনের মতো শরীরেও পরিবর্তনের হাওয়া লাগে। বাম-ডান বুক আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। নরম মাংস বুকে আস্তানা গাড়ছে, দুই এক ফোটা অবাঞ্ছিত রক্ত সালোয়ারের এখানে-সেখানে পড়া আরম্ভ করেছে। একদিন রাতে...।

সেদিন বড় ভাইটা তার বুকে হাত দিয়ে কি যেন খোজে, চিৎ করে ফেলে কি সব করে।

মেয়েটা কষ্টে কুকড়ে উঠে। কি হলো তার বুঝতে বেশি দিন লাগলো না। কারণ ভিসিপি দেখে দেখে সে অনেক কিছু খুব দ্রুত শিখে নিল। সে ঘরের সদস্যরা ভাত না খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু হিন্দি সিনেমা না দেখে কখনো থাকতে পারে না।

এভাবে শুরু, চলে প্রায় রাত। মেয়েটা কিছু বলতে পারে না। পাছে আশ্রয় হারায়! তিনবেলা পেট পুরে ভাত তাকে চুপ করিয়ে দিল।

সময় যায়, নতুন নতুন অভিজ্ঞতাও হয় তার। এরই মাঝে শেষে সেজটা যে মেলা থেকে বোন বলে এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এরপরে তার ছোটটাও গোপনে গোপনে তার কাছে যায়। বুকে হাত চালায়, কেড়ে নেয় তার সব।

সেদিন খুব ঝগড়া হলো বাবা মায়ের মধ্যে। পুরো বাড়ি পিনপতন নীরব হয়ে রইলো। অন্ধকার ঠেলে বড় ভাইটা তার ঘরে যায়। ফিরে চলে আসার সময় সেজটার সঙ্গে ক্রস হয়। দুজনেই জানে কে কোথায় যাচ্ছে। কোথা থেকে আসছে। তাই কোনো কথা না বলে দুজনে নিজেদের পথে পা বাড়ায়।

ইদানীং তার কান্না আসে ক্ষণে ক্ষণে। কারণ ভাইদের অনেক বন্ধুও সুযোগ বুঝে বুকে হাত দিতে চায়। বিশ্রী কথা বলে। সে পালাতে চায় বহুদূরে, কিন্তু বাবার জন্য কষ্ট হয় খুব। সে ভেবে নেয় যেদিন বাবাটা এ দুনিয়া থেকে চলে যাবে সেদিন সেও তার সঙ্গে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবে, বিয়ে করবে, সংসারী হবে।

তার নাম আজমল। আজমল তাকে ভালোবেসে ক্ষীণ স্বপ্ন নিয়ে কাছে আসে।

বাবার ভয়ানক অসুখ হলো। কতোদিন বাচে ঠিক নেই। তাই বড় ভাইকে বিয়ে করাবেন। বৌ ঠিক করা হলো। বিয়ের দুই দিন আগে বড় ভাই এক দুই করে তিনবার তার শরীরে চেপে বসলো। তার বুকটা দুই হাতে পিষে দিলে অসহ্য যন্ত্রণায় সে কেদে ওঠে।

বড় ভাইটা ভাবলো তার বিয়ে হয়ে যাচ্ছে বলে সে কাদছে। তাই আদর করে কাছে টেনে বললো, তোকে আমি দেখে শুনে বিয়ে দেবো।

বাবার অসুখ চরমে উঠলো। মেয়েটার বুকের ভেতর কষ্টের একটা ঢেউ দলা পাকিয়ে উঠলো বাবার জন্য। প্রায় সময় মাতাল হয়ে থাকা এ মানুষটাই কেবল আদম স্নেহের হাত তার মাথায় বুলিয়ে নিজের মেয়ের মতো আদর করতেন। ভালো ঘরে বিয়ে দিয়ে সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখাতেন। আবার তার অসীম আনন্দও লাগছে। কারণ এ মানুষটা বিদায় নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ দোজখ থেকে সে মুক্তি নেবে।

আজমলের হাত ধরে সে চলে যাবে দূরে যেখানে রাশি রাশি শুভ্র সুখ তার জীবনের সমস্ত ক্ষত মুছে দেবে। আজমলকে খবর পাঠানো হলো। বাবাটা মরলো, সে দোজখ ছেড়ে স্বপ্নের জীবনের জন্য পা বাড়ালো। এতোক্ষণ ধরে এ পার্কে অপেক্ষা করে শেষমেষ সে বুঝলো, আজমলও ভাইদের মতো ভালোবাসার কথা বলে কেবল তার দেহকে ভোগ করেছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মেয়েটাকে বললাম, চলো, তোমার থাকার ব্যবস্থা করছি।

মেয়েটা একটুও সন্দেহ না করে আমার পিছু পিছু আসতে লাগলো।

তাকে মেরাজ ফকিরের বাড়িতে দিয়ে এলাম।

বুড়ো ন্যাংড়া মেরাজ ফকির সওয়াব কামানোর নতুন উপায় পেয়ে খুশিতে ঝলমল করে উঠলো।

ফুটপাথ দিয়ে হাটছি। হালকা শীত লাগছে। একে আমি *আদুরে শীত* বলি। মেয়েটার কথা মাথার ভেতর ঘুরছে।

ওহো, তার নাম তো জানা হলো না। অবশ্য কাল সকালেই মেরাজ ফকির আমার অফিসে ফোন করে নানান কথা বলবেন। তখন তার নাম জেনে নেয়া যাবে। আমি মেরাজ ফকিরের এসব বিলাসিতা দেখে দারুণ মজা পাই।

চট্টগ্রাম থেকে

শুধু মুসকান এবং আমি

- বান্দর

বিয়ের পরই বিদেশ চলে যাওয়ার কথা মুসকানের। সেই মতো চলে গেল তারা। আমার জানা ছিল না, এতো সহজেই এবং এতো তাড়াতাড়ি বিয়ের একটা আয়োজন করে শেষ হয়ে যেতে পারে। নীতি অনুসারে আমার প্রিয় মানুষদের বিয়েতে উপস্থিত হইনি। উপস্থিত হবোই বা কেমন করে! তখন আমি ড্রংক করে নেশায় বুদ হয়েছিলাম।

বেশি দিন নেশা করে থাকতে হয়নি। তাড়াহুড়ো করে মুসকান-এর ইচ্ছাতেই দেশ ছেড়েছে তার স্বামী।

পরে জেনেছি, বিয়ের দিন অনেক কেদেছিল মেয়েটা। অথচ চোখের জল ফেলার কোনো কারণ ছিল না। বরং আনন্দের কথা, চমৎকার যোগ্য স্বামী পেয়েছে।

আমাদের সম্পর্কটা হতে পারে কি না এ নিয়ে যদি একটা জরিপ চালানো হয় তাহলে শূন্য পারসেন্ট না - এর পক্ষে এবং কল্পনা করতে পারবে না সেন্ট পারসেন্ট। শুধু আমাকে পছন্দের জন্য তারিফ করতে পারি না মুসকানকে।

বেশ কয়েক বছর হলো *ছ্যাকা* খেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি মেয়েদের ধারে-কাছেই নেই, এমনই চলছিল দিনগুলো। খারাপ লাগছিল না। এক ধরনের মজা পাচ্ছিলাম। কেন জানি না। হঠাৎ খেয়াল করলাম মুসকানের ব্যতিক্রমী ভাবভঙ্গি। ভেবেছিলাম ভুল দেখছি আমি। এসবের কোনো অর্থ করার চেষ্টা করিনি। খাচ্ছি, দাচ্ছি, টেনশন ফ্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। বারবার মুসকানের সামনে পড়লেই একই ভাবভঙ্গি দেখে কেন জানি আমার মনে ঘণ্টা বাজতে শুরু করলো। কিন্তু সাহস করলাম না কিছু বলার। পাছে প্রত্যাখ্যান করে, আমাকে অপমান করে!

যখন জানতে পারলাম, মুসকান পছন্দ করে আমাকে তখন মনে হলো সাত আসমান আমার মাথায় ভেঙে পড়েছে। এর চেয়ে বিশ্বাস করা সহজ সূর্য রাতের বেলা কিংবা পশ্চিমে ওঠে।

জানিয়ে রাখি, মুসকান দেখতে অসাধারণ না হলেও সাধারণ নয়। ক্যাম্পাসে, ক্লাসের প্রতিটা ছেলের কেন্দ্রবিন্দু মুসকান। সে জানে। কিন্তু কাউকে পাত্তা দেয় না। বন্ধুত্ব করতেই ভিড়তে দেয় না। একবার যদি মুখে হ্যা বলে প্রেম করবে তাহলে বাড়ির সামনে ছেলেরা লাইন দিয়ে দেবে। বিশ্বাস করুন তার কাছে আমি একদম বেমানান। আমি তো জানি দেখতে কেমন!

তারপরও মুসকান যখন বলে, তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল তখন কোথায় লুকাবো জায়গা খুজে পাই না। তাকে বলেছি, দুনিয়ায় কি আর লোক পেলে না? ছয়শ কোটি মানুষের মধ্যে আমার মতো অধমকে পেলে?

সে মুচকি হেসে উত্তর দেবে, বেয়াদব, অসভ্য। পেলে কি আর তোমার কাছে আসতাম? তুমি তো আমাকে পটিয়েছো অর্থাৎ ভুলিয়ে ভালিয়ে কিছু করা।

এভাবেই চমৎকার দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ জানালো, তাকে দেখতে আসছে।

এই ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি সব কিছু হবে, স্বপ্নেও ভাবতেই পারেনি।

ছোটখাটো একটা চাকরি হয়েছে। মা বাবা চাইছেন ঘরে একটা সুন্দরী বৌ নিয়ে আসবেন। আমার কোনো অনুভূতি নেই। শুধু সামাজিকতা পালন করা আর কি!

মুসকান জানে সে আমার জীবনে কতোটা ছাপ ফেলে গেছে। অন্য কোনো মেয়েকেই আমার ভালো লাগে না। মুসকানের কাছেই পেলাম জীবনের অমূল্য কিছু ভালোবাসা। আগের মেয়েটার কাছে পেয়েছিলাম জীবনের সবচেয়ে বড় ধোকাটা। এখন বিয়ে করা বৌয়ের কাছে কোনো প্রত্যাশা নেই।

দিনক্ষণ দেখে বাবা-মা বিয়ে করিয়ে দিলেন। সুন্দরী বৌ। বাবা মায়ের যত্নসহ আমাকে ভালোবাসার কোনো কমতি নেই। আমার কোনো রকম লাগে না।

একদিন রাতে ঘুমাতে যাবার আগে আমাকে আমার মিসেস জিজ্ঞাসা করলো, কেন বৌ হয়ে স্বামীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত?

উত্তর দিতে গিয়ে দেখলাম বৌয়ের চোখে পানি। ভাবলেশহীনভাবে তাকিয়ে রইলাম। কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না? সিগারেট, ম্যাচ নিয়ে বারান্দায় চলে এলাম। দেখলাম আকাশে চাদ উঠেছে। মনে পড়ে গেল মুসকানের ফেলে যাওয়া স্মৃতি।

বাড়ির বাইরে ছিলাম। এরই মধ্যে আমার জন্মদিন। যাবার আগে বলে গিয়েছিলাম, আকাশের ওই চাদ উঠলে বাড়ি থেকে তুমিও দেখবে, আমিও দেখবো। চাদের মাধ্যমে হবে আমাদের কথোপকথন।

সে বলেছিল, বাংলা সিনেমার ডায়ালগ?

বলেছিলাম, হিন্দি সিনেমার।

পরক্ষণেই দুজনেই হেসে উঠেছিলাম।

ঠিক এভাবেই আমার প্রতিটি মুহূর্তে শুধু মুসকানের কথা মনে পড়ে।

পাঠকবৃন্দ হয়তো ভাবছেন, কি অমানুষ রে বাবা! কেন মুসকানকেই বিয়ে করলাম না, কেনই বা বিয়ে করা বৌকেই ভালোবাসতে পারছি না?

মুসকান ছিল সুদর্শনা ডাক্তারি পড়ুয়া মেয়ে যার কাছে ইন্টারমিডিয়েট পাস ছোটখাটো গড়নের এই ছেলেটি গুণেমানেই বাদ পড়ে যাবে।

ডাক্তার মুসকান আমার প্রথম বাচ্চার সময় অপারেশন থিয়েটারে থাকবে বলে কথা দিয়েছিল। বলেছিলাম, রোগী হিসেবে তোমাকে দেখতে চাই, ডাক্তার হিসেবে পেতে চাই না। টাকা দিলে অনেক ডাক্তার পাওয়া যাবে। কিন্তু এমন রোগী পাওয়া যাবে না।

বলেছিল, অসভ্য। মুখের ব্যালান্স নেই।

মুসকান জানতো, আমার একটা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আছে। জানতো কতোটা ঘনিষ্ঠ ছিলাম আমরা। একে অপরের সঙ্গে। তারপরও মুসকান ভালোবেসেছে। সে অপেক্ষা করেছে কতো বছর। সামনের ঈদে আমরা অনেক মজা করবো বলে পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু বিধি বাম। তার আগেই ঘটে গেল অনেক ঘটনা।

যে কথাটা এখনো কেউ জানে না সেটা হলো, আমাদের ধর্মের পার্থক্য রয়েছে। আমি সংখ্যালঘুদের (আওয়ামী লীগের ভাষায়) মধ্যে জন্ম নেয়া একজন বাংলাদেশি।

যেদিন ধোকাটা খেলাম আগের মেয়েটার কাছে সেদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম নিজের ধর্মের কোনো মেয়েকে কখনো পাত্তা দেবো না। সম্ভব হলে অন্য ধর্মের মেয়ে, আরো যদি সম্ভব হয় সংখ্যাগুরু কোনো মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করবো।

আগের মেয়েটা অবশ্য জানতে পারেনি। সেটাই ভালো হয়েছে।

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

লটারি

- নিলুফার কবির

খুব ছোটবেলায় বিমানে করে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর প্রচণ্ড সাধ জাগাতো আমার। বিয়ের পর স্বামীর বদৌলতে সে ইচ্ছা পূরণ হলো।

বিয়ের তিন বছর পর জীবনের প্রথম প্লেনে করে ইনডিয়া বেড়াতে যাই আমরা। স্বামী ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে প্রায়ই তার দেশের বাইরে যেতে হতো। নেপাল, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জাপান, সিংগাপুর, হংকং, থাইল্যান্ড, সুইটজারল্যান্ড, ইউএই ইত্যাদি দেশে তার সফরসঙ্গী ছিলাম। বিভিন্ন দেশ-বিদেশ ঘুরে বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা নিয়ে যখন দেশে ফিরতাম তখন নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করতাম। বিধাতার কাছে দুই হাত তুলে আমার স্বামীর জন্য দোয়া করতাম।

দুই বছর আগের কথা। মাত্র তিন দিনের জন্য জরুরি ব্যবসার কাজে তিনি দুবাই যাবেন। ভেবেছিলাম এতো কম সময়ে হয়তো এবার আমার যাওয়া হবে না। যাওয়ার আগের দিন অফিস থেকে এসে আমাকে চমকে দিয়ে বললেন, তুমিও যাচ্ছো, সব গুছিয়ে নাও।

আমি তো আনন্দে দিশেহারা। কারণ দুবাই যাওয়ার ইচ্ছে ছিল আমার অনেক দিনের।

সয়ম মতো আমরা দুবাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। এয়ারপোর্টে পৌছেই দেখি দুবাই অফিসের পৃন্সিপাল তার লোক দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে আমাদের হোটেলে পৌছে দেয়ার জন্য।

যথাসময়ে আমরা হোটেলে পৌছালাম। কাপড়-চোপর ছেড়ে ফ্রেশ হয়ে আমরা রেস্টুরেন্টে টুকটাক কিছু খেয়ে লবিতে গিয়ে বসলাম। বিরাট হোটেল। চারদিকে লাইটের আলোতে ঝলমল করছে। মনে হচ্ছিল একটা স্বপ্নপুরীতে বসে আছি দুজনে।

একটু পরই পৃন্সিপাল গরডন ও অফিসের আরেকজন এলো আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তারপর শুরু হয়ে গেল তাদের মিটিং।

পরদিন নয়টার মধ্যেই তাদের অফিস ভিজিটে করার জন্য আমাদের নিয়ে গেল। একা হোটেলে থাকবো এ জন্য আমিও গেলাম। অফিসে তাদের মিটিং রুমের এক কোণায় একগাদা ম্যাগাজিন দিয়ে আমাকে বসিযে তারা তাদের কাজ শুরু করলো। একটু পর পর চা, কফি, কেক, বিস্কিট দিয়ে আপ্যায়ন করলো আমায়।

চা খেতে খেতে কাচের জানালা দিয়ে বাইরের সব বড় দালান-কোঠা দেখছিলাম। দুবাইতে প্রচণ্ড গরম। এতো গরমের মধ্যে কেমন করে তারা দেশকে এতো উন্নত করেছে ভেবে অবাক হলাম।

মিটিং শেষে গরডন এসে আমাকে বললেন, আজ বিকেলে তেমন কোনো কাজ নেই। তোমরা দুবাইর গোল্ড সুক (Gold Souk) ঘুরে এসো। গোল্ড সুক মানে সোনার মার্কেট। না হলে মিস করবে।

কালকের দিনটাই শুধু আমাদের হাতে, পরশু আমাদের ফ্লাইট। এতো বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে এ জন্য ঠিক পাচটায় হোটেলে গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলে আমরা চলে এলাম।

হোটেলে এসে লাঞ্চ সেরে একটু রেস্ট না নিতেই সাড়ে চারটা বেজে গেল। তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিচে নেমেই দেখি ড্রাইভার লবিতে অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।

আধঘণ্টা পর দুবাই শহরের আংশিক দেখতে দেখতে আমরা সোনার মার্কেটে পৌছালাম। ওখানে গিয়ে তো আমার চোখ ছানাবড়া! এতো বড় সোনার মার্কেট সত্যি আর দেখিনি। প্রতিটি দোকানে মনে হচ্ছে হলুদের আভা ছড়িয়ে রেখেছে। যেদিকেই তাকাই শুধু সোনা এবং সোনা। অবাক দৃষ্টিতে শুধু দেখছি।

ঠিক এ সময় তিনি আমার কানে কানে বলছেন, কিছু কিনবে?

তার কথায় খুব খুশি হয়ে বললাম, কি আর কিনবো? দেখেই মনে হচ্ছে শখ মিটে গেছে।

তিনি আমার হাত ধরে পাশে একটা বড় দোকানে নিয়ে গেলেন। সেলসম্যানকে চারটা চুড়ি দেখিয়ে বের করতে বললেন। তারপর আমার হাতে পরিয়ে দেখছেন ঠিক আছে কি না।

চুড়িগুলো আমারও খুব পছন্দ হলো। চুড়ির দাম তাদের হাতে দিতেই তারা কয়টা কুপন আমাদের হাতে দিয়ে বললো, নাম, ঠিকানা এবং পাসপোর্ট নাম্বার লিখে বক্সে ফেলে যান। আর কোণায় কয়েন দিয়ে ঘষে ভাগ্য পরীক্ষা করে নিন।

বক্সে ফেলার কারণ প্রতি সপ্তাহে তাদের লটারি হয়। দেশ-বিদেশের বহু মানুষ এখানে এসে স্বর্ণ কেনে। ক্রেতাদের আকর্ষণের জন্যই এ ব্যবস্থা।

আমি তো চুড়ি পেয়ে মহা খুশি কখন হোটেলে ফিরবো! প্রচণ্ড অস্থিরতা নিয়েই কয়েন দিয়ে ঘষতে লাগলাম একটার পর একটা। আবার কুপন পূরণ করা, তাড়াতাড়ির জন্য দুজনে ভাগ করে নিলাম। তারগুলো শেষ। আমার শেষ কুপনটা পূরণ করে ঘষতেই চোখে পড়লো স্পষ্ট অক্ষরে পাচশ দেহরাম!

চিৎকার দিয়ে উঠলাম। তিনি প্রথমে চেক করলেন ঠিক আছে কি না। এরই মধ্যে আশপাশের দোকান থেকে সব এলো। দোকানে হই চই পড়ে গেল। আরবিতে কে কি বলছে বুঝতে পারছি না।

ভিড়ের মধ্যে একজন বললো, সত্যি খুব ভাগ্যবান। বিদেশে এসে লটারি জেতা?

বাংলা কথা শুনে চমকে উঠে পাশ ফিরে দেখি এক বাঙালি পরিবার। তারাও এসেছে স্বর্ণ কিনতে।

পাচশ দেহরাম আমাকে না দিয়ে তারা ওই দামেরই খুব সুন্দর একটা চেইন আমার হাতে দিল। আমার স্বামীদেবতা সঙ্গে সঙ্গেই চেইনটা আমার গলায় পরিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আনন্দে দিশেহারা আমিও তাই করলাম। ছোট একটা চেইনের জন্য এ আনন্দ নয়, বিদেশের মাটিতে এসে লটারিতে চেইন পাওয়া! এটাই ছিল আমাদের আনন্দের কারণ।

দেশে ফিরে সবাইকে খবরটা দেয়ার পর সবাই আমাকে ও চেইন দেখে খুশিতে নানানজনে নানান মন্তব্য করলো। কেউ লাকি, কেউ ভাগ্যবতী। এসব আর কি!

আজ খুব দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে লিখতে হচ্ছে যে, আমার সেই স্মরণীয় দিনের স্মরণীয় চেইনটি মেয়ের বিয়ের দিন টেবিলের ওপরে রাখা কৌটাসহ চুরি হয়ে গেছে। সেটাতে আরো গয়না ছিল।

কিন্তু সেগুলোর জন্য আমার খারাপ লাগেনি। চেইনটি চুরি হওয়ার পর খুব কেদেছিলাম।

সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল।

কিছুতেই কান্না থামছিল না।

স্বামীদেবতা সান্ত্বনা দিতে এসে দেখি তার নিজেরই চোখে পানি। কাছে এসে বললেন, যেখানে খুজে পাই সেখান থেকে এমন একটা চেইন তোমাকে এনে দেবো। কেদো না, প্লিজ!

লালমাটিয়া, ঢাকা থেকে

মুন্না

- মোহাম্মদ শাহেদুল কবির রুবেল

বাবার চাকরি সূত্রে তখন আমরা কুমিল্লায়। বন বিভাগে চাকরি করেন তিনি। কলোনিতেই থাকি তখন। আমাদের প্রতিবেশীর বাড়িও ছিল কুমিল্লায়। খুব মজার মানুষ ছিলেন তারা। তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ছিল খুব ভালো।

তারা একটি ছাগল পালতেন। ছাগলটির নাম ছিল মুন্না। আমরা সবাই মুন্নাকে খুব আদর করতাম। তারা তো মুন্নাকে তাদের পরিবারের একজন সদস্য মনে করতো।

এদিকে আবার প্রতিবেশী আংকল জটিল রোগে আক্রান্ত হলেন। দুই মাস ধরে চিকিৎসা করেও কোনো ফল হলো না। দিন দিন অবস্থার অবনতি হতে লাগলো।

ঠিক এমন সময় হঠাৎ একদিন ভোর রাতে তাদের চিৎকার, চেচামেচি ও কান্নাকাটিতে আমাদের এবং কলোনির সবার ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে আধো জাগো অবস্থায় উদ্বিগ্ন মনে তাদের বাসায় গিয়ে দেখলাম বাসার সবাই এলোমেলো অবস্থায় খুব কান্নাকাটি করছে।

আমাদেরও খুব মন খারাপ হলো। চোখে পানি এসে গেল।

আমার চোখে পানি দেখে মা বললেন, তুই কাদছিস কেন।

বললাম, আংকলের জন্য খুব খারাপ লাগছে।

মা বললেন, তোর আংকলের তো কিছু হয়নি। মুন্না মারা গিয়েছে।

বাদুরতলা, চট্টগ্রাম থেকে

টাকার গোলাম

সেদিন ছিল ১ জুলাই। আমি এবং আমার এক বান্ধবী দুজন মিলে ইউনিভার্সিটি এলাকায় ফুলার রোডে আড্ডা দিচ্ছিলাম। আড্ডা শেষে বাসায় ফেরার সময় রাত সাড়ে আটটা কি নয়টা এমন হবে। আমাদের বাসা ছিল আজিমপুর। রিকশা যখন নীলক্ষেত মোড় অতিক্রম করে হোম ইকনমিক্স কলেজের সামনে দিয়ে আজিমপুরের দিকে যাচ্ছি পেছন থেকে ডাক শোনা গেল এই রিকশা, এই রিকশা।

রিকশাচালক এ কথায় কর্ণপাত না করে চলে যাচ্ছিল।

পেছনে তাকিয়ে দেখি দুজন পুলিশ পেছনে পেছনে ছুটছে।

জ্যামে পড়ার কারণে তারা এসে আমাদের রিকশা ইডেন কলেজের গেটের সামনে ধরলো। এবং রিকশাচালককে দিল কয়েক ঘা পিটুনি বন্দুকের গোড়া দিয়ে।

তারপর আমাদের অনুরোধে তার রক্ষা হলো। শুরু হলো আমাদের পালা। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। আমি তো নাজেহাল। আমাকে প্রশ্ন করতেই আমি উত্তর দিলাম। ঢাকা কলেজের অনার্স ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র আর সে বদরুন্নেসা কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছে।

পরিচয় দিয়েও কোনো লাভ হলো না। পরিচয়পত্র দেখলো। কিন্তু সে তার সময়সীমা হিসাব করতে পারলো না। এতোটাই শিক্ষিত সে ছিল। শুরু হলো ভীতি দেখানো অনেক কথা।

থানায় চলুন, আপনাদের আপত্তিকর অবস্থায় দেখেছি। যা বলার কোর্টে বলবেন ইত্যাদি। অজুহাতের শেষ নেই।

আসলে কিছুই হয়নি। রিকশার হুড ওঠানো ছিল এবং দুজন দুজনার হাত ধরে বসেছিলাম। তারা আমাদের সঙ্গে জোরে জোরে কথা বলছিল।

পরিচয়পত্র দেখিয়েও শেষ রক্ষা হলো না। নিজেদের মানসম্মান রক্ষার্থে তাড়াতাড়ি চলে আসার জন্য তাকে টাকা দিতে বাধ্য হলাম। কারণ পুলিশ যে জনগণের গোলাম, তারা যে টাকার গোলাম তা আমার ভালো ভাবেই জানা ছিল।

পঞ্চাশ টাকা তার হাতে দিলাম।

সে কিছুতেই কিছু শুনছে না।

যখন তাকে একশ টাকা দিলাম, সে তা নিল। শুধু তাই নয়, সে কি ভদ্র ব্যবহার! তার মতো মানুষই হয় না। আপনারা ছাত্র মানুষ, প্রেম করেন, রুমে চলে যাবেন। রাস্তায় চললে পরিচিত লোকজন দেখলে কি ভাববে?

রুমে যা কিছু করেন কেউ দেখবে না। তাছাড়া দিনকাল ভালো না, রাস্তায় নানান সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ছিনতাইকারী ইত্যাদি।

টাকার কাছে এসব আইনের লোকও নতি স্বীকারে বাধ্য? এসব পুলিশ ভাইদের কাছে আমার অনুরোধ, দৈহিক প্রেমে বাধা দিন, অন্তরের প্রেমে বাধা দেবেন না। এবং দুই চার টাকার বিনিময়ে নিজেদের চরিত্রটাকে কলংকিত করবেন না।

নাম ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

দিন রাত

অনামিকা

এভাবেই চলে যায় আমার প্রতিটি দিন এবং রাত। আমার দিনটা যায় খুব সুখে-সুখ পেয়ে এবং রাতটা যায় খুব আরামে, একেবারেই নিশ্চিন্তে। শুধুই খাওয়া আর চটপট শুয়ে পড়া, তারপর গভীর ঘুমে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়া।

আমার স্বামী বড়ই ভালো মানুষ। রাতে আমাকে একদম জ্বালায় না।

মাঝে মধ্যে তার নাকের ডাকে আমার ঘুমের কিছুটা ক্ষতি হয়। তবুও তো ভালো, কোনো খটখট, নটঘট নেই। সমরেশের কি একটা উপন্যাসে দুটো ছন্দময় লাইন আছে- *রাত দুপুরে খটখট, খাটটা করে চটপট। চারপোকারা পড়লো চাপা দেখতে এসে নটঘট*।

মনে হলে হাসতে হাসতে একেবারে গড়িয়ে পড়ি। রাত দুপুরে নটঘট! তারপর ছারপোকা দেখে দেখে রাত কাটানো। কি বিশ্রি ব্যাপার! এই রাত-দুপুরে বিশ্রী নটঘটে ব্যাপারটা আমাদের নেই, এই ইওরোপে ছারপোকাও তো নেই যে, দেখব!

একটা চাকরি করি। বাধ্য হয়েই করতে হয়। ইওরোপে যারা বৌ নিয়ে থাকে তারা একা রোজগার করে বৌ চালাতে পারে না। এটা ইওরোপের নিয়মও নয়। আমাদের দেশে স্বামীরা রোজগার করে আর বৌরা তাদের ঘাড়ের ওপর বসে পা নাচিয়ে খায়। এটা ইওরোপের কোনো নারী কল্পনাও করতে পারে না। তাদের মধ্যে বিয়েশাদিও কম হয়। তারা লিভ টুগেদার করে। কিন্তু ব্যয় করে যার যার আয় থেকে। এবং বিয়ে করলেও সংসারের খরচ দুজনকেই দিতে হয়। দুজনের কোনো একজন আয় না করলে তাদের সংসার বেশি দিন টেকে না। আমাদের মধ্যে যাদের বৌরা চাকরি করে না তাদের সংসার একেবারে ভেঙে যায় না। কিন্তু নড়বড়ে হয়ে যায়। *নুন আনতে পানতা ফুরোয়*।

বাংলাদেশের একটা দিনমজুরের সংসার এর চেয়ে ভালো চলে। কারণ সে যেনতেনভাবে চালিয়ে যেতে পারে। এখানে তা সম্ভব নয়। এখানে বৌ নিয়ে থাকতে হলে অন্তত একটা ফ্ল্যাট এবং একটা গাড়ি একান্তই প্রয়োজন। বাড়ি, গাড়ি, নারী এক সঙ্গে এই তিনটা হাতি পোষা হাজার বারোশ ইওরো রোজগারের একজন পুরুষের পক্ষে কল্পনারও অতীত। তাই আমাকে চাকরিটা করতে হচ্ছে। এতেই আমার পোয়া বারো।

আমার চাকরিটা পার্ট-টাইম। মাত্র চার ঘণ্টার। দুপুর একটায় ডিউটি শেষ হওয়ার পর একেবারে রাত দশটা পর্যন্ত কোনো কাজ থাকে না। রান্নাবান্না তো আমার ওই ভালো মানুষ স্বামীটাই করে। আমি মেয়ে মানুষ, চার ঘণ্টার একটা চাকরি করি বলে আমার প্রতি এটা তার একটা সিম্প্যাথি হয়তো। তাই আগে ওই অবসর সময়টা কাটাতে আমার খুব কষ্ট হতো। এখন আর তা হয় না। এখন তো শুধুই সুখ।

একদিন একটা জরুরি প্রয়োজনে দুপুরে এক জায়গায় যেতে হবে। দিনের পুরোটা সময় আমার স্বামী ডিউটিতে থাকে। গাড়ি নেই, আমি কি করে যাবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। অবশেষে ব্যবস্থাটা আমার স্বামীই করে দিলেন।

তার এক বন্ধু বাসার কাছাকাছি একটা জায়গায় চাকরি করে। দুপুর একটা থেকে দুটো তার লাঞ্চ টাইম। কথা হলো আমি ডিউটি শেষ করে বাসে তার ফ্যাক্টরিতে চলে আসবো। তারপর তিনি আমাকে নিয়ে মাত্র দশ মিনিটের কাজটা সেরে দেবেন। পরদিন কথা মতো তার ফ্যাক্টরিতে চলে এলাম। ওখানে তিনিই শুধু বাংলাদেশি। একটা ছোট রুমে তিনি দুপুরে লাঞ্চ করেন এবং রেস্ট নেন। অন্যরা সবাই যার যার বাসা অথবা রেস্টুরেন্টে চলে যায়।

আমি যখন গিয়ে পৌছালাম তখন তিনি লাঞ্চ করছিলেন। আমার বাসায় গিয়ে লাঞ্চ করার কথা থাকলেও সেদিন তার অনুরোধ না ফেলতে পেরে তার প্লেটেই ভাগ বসালাম। একেই বলে রিজিক, যার যেখানে আছে সেখানেই তাকে যেতে হয়।

খানা শেষে তিনি বললেন, ভাবী, সময় যখন আছে দশ মিনিট একটু রেস্ট নিই। আমার যেন একটু মাথা ব্যথা করছে।

সায় দিলাম।

একটা হাতা ছাড়া চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত দুটো মাথার পেছনে নিয়ে আঙুলগুলো পরস্পরের ভেতর আটকে দিয়ে তিনি চোখ বুজলেন। একা বসে থাকতে আমার অস্বস্তি হচ্ছিল। এক মিনিট যেতে না যেতেই হঠাৎ আমার মাথায় যেন কি একটা খেলে গেল। বললাম, ভাই, খুব বেশি মাথা ব্যথা হলে একটু টিপে দিই না হয়। তিনি যেন এ কথার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। একটু মুচকি হেসে বললেন, দেবেন! দিলে তো ভালোই হতো। আমিও সম্মতি সূচক মুচকি হেসে আস্তে আস্তে চেয়ারের পেছনে গিয়ে দাড়ালাম।

তিনি মাথা উর্ধমুখী করে একটু পেছন ফিরে আমার দিকে তাকালেন।

চোখাচোখি হতে আমাদের মধ্যে যেন কি একটা কথা হয়ে গেল। আমার হাত দুটো আস্তে করে তার কপালের ওপর রাখলাম। কিন্তু টিপে দেয়ার আর সময় পেলাম না। তার হাত দুটো তখনো আগের মতো মাথার পেছনে আটকানো ছিল। আস্তে আস্তে এগুলোকে সামনে এনে তিনি আমার হাত দুটোকে চেপে ধরলেন। হঠাৎ কেপে উঠলো আমার সমস্ত শরীর। একটা ভয়, নাকি ভালো লাগার অনুভূতি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

তিনি আমার হাত দুটো ধরে সামনের দিকে টানলেন।

আমি পেছন থেকে হুমড়ি খেয়ে তার কাধের ওপর পড়ে গেলাম। আমার বাম গাল তার ডান গালের সঙ্গে ঘষা লাগলো। শক্ত খোচা খোচা দাড়ি। একটু যেন আরাম লাগছিল আমার। কয়েক সেকেন্ড সরালাম না।

আচমকা তিনি আমাকে টেনে তার কোলের ওপর নিয়ে গিয়ে আমাকে বুকের ভেতর একেবারে চেপে ধরলেন। তারপর একটু আলগা করে প্রচণ্ড আবেগে চুমু খেলেন আমাকে।

হঠাৎ আমার কান্না পেয়ে গেল। আমি গুমরে কেদে উঠে একেবারে অসহায়ের মতো নিজেকে সমর্পণ করে দিলাম তার কাছে।

তিনি আমার চুলে হাত বুলিয়ে, আমার দুচোখে বার বার চুমু খেয়ে আমাকে সান্ত্বনা দিলেন, অনেক আদর করলেন আমাকে।

তারপর কি করে যেন আরো অনেক কিছু হয়ে গেল।

আমার সমস্ত শরীর জুড়িয়ে গেল। আমি যেন বহু দিনের তৃষ্ণার্ত ছিলাম। হঠাৎ করেই ঘরের পাশের কচু পাতায় জমে থাকা কয়েকটি শিশির বিন্দু আমার প্রাণটা একেবারে ভরে দিল।

এটাই কি তাহলে নটঘট? সমরেশের ওই কথাগুলো এখন আর আমার মন থেকে যায় না। তবে আমি কথাগুলোকে একটু নিজের মতো করে সাজিয়ে নিই।

দিনদুপুরে নটঘট, চেয়ার করে খটখট। আমরা ওটা সেরে ফেলি চটপট, চটপট।

তার বৌ খুব ভালো মেয়ে। আমারও বান্ধবী ছিল সে। ওই দিনের আলোয় নটঘটটা প্রথম যেদিন হয়েছিল তারপর থেকে তার সামনে ঠিকঠাকভাবে দাড়াতে পারতাম না। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হতো। দিনের পর দিন মেয়েটাকে ঠকিয়ে যাচ্ছিলাম।

আমার আচরণ থেকেই কিছু একটা সন্দেহ করে ফেললো সে। তারপর একদিন ঠিকঠাক ধরা পড়ে গেলাম তার হাতেই। মেয়েটা বড় বোকা। শত হলেও নিজের স্বামী, তাকে কেউ হেয় করে!

যেন কয়েক মুহূর্তের মধ্যে জেনে গেল সব বাংলাদেশিরা। এখন রাস্তায় বের হলেই লোকজন চিড়িয়াখানার জন্তুর মতো আমাদেরকে দেখে। তাতে আমাদের *থোড়াই কেয়ার* ইটালিয়ান ভাষায় বলে, *প্রেগা নিয়েন্তে*। কারণ ইওরোপে স্বেচ্ছায় কে কার সঙ্গে কি করলো তা নিয়ে অন্য কারো মাথা ঘামানোর কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু আমাদের যে একটা নিজস্ব সমাজ, সোসাইটি আছে তাতে নিজেকে খুবই ছোট, ইতর প্রাণীর মতো মনে হয় আমার।

তবুও আমি যে এতো দিনে তার শরীরের সমস্ত লোমকুপ চিনে ফেলেছি, সে যে আমার শরীরের সমস্ত অলিগলিতে ইচ্ছা মতো হেটেছে তা তো আমরা সহজেই ভুলে যেতে পারি না।

দিনে চার ঘণ্টার কাজ, তারপর আরো অনেক কিছু। আমি একদম ক্লান্ত হয়ে যাই। সুখের জন্যও মানুষ ক্লান্ত হয়। তারপর রাত না হতে হতেই বিছানায়। এরপর বড্ড আরামের ঘুমের ভেতর ডুবে যাওয়া। এভাবেই কেটে যায় আমার প্রতিটি দিন এবং রাত।

ইটালি থেকে